হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

এর মাওয়ায়েয ও মলফূযাতের সংক্ষিপ্ত-সার

মুসলমানের হাসি

মওলানা মুহাম্মদ রাজি নোমানী

ওয়ায়েজ

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ঢাকা

ও

পরিচালক

মারকাজে উলূমুল কোরআন

২৮/২১, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মুসলমানের হাসি

আরজ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানুবী (রঃ) এর মাওয়ায়েজ ও মলফুযাত থেকে সংগৃহীত হাসির উদ্রেক সৃষ্টিকারী ঘটনা নিয়ে 'মুসলমানের হাসি' বইটি প্রকাশিত হলো। যে-সকল যুবক ভায়েরা বাজারের অনর্থক হাসির গল্পের বই পড়ে সময় নষ্ট করছেন তাদের জন্যে এই বই খুব উপযোগী হবে। কারণ এই সকল ঘটনা বা গল্পের মধ্যে যেমন হাসির খোরাক রয়েছে তেমনি গভীর শিক্ষার বিষয় রয়ে গেছে। হযরত থানুবী (রঃ) কোরআন ও হাদীসের এক একটি জটিল বিষয়কে সহজ করার জন্যে এমন সকল ঘটনার অবতারণা করেছেন যা মনে হয়েছে ঐ ঘটনা ছাড়া বিষয়টি এত সহজ করা সম্ভব ছিল না।

সাধারণ পাঠক যেমন এই কেতাব দ্বারা উপকৃত হবেন তেমনি আলেম-উলামা ও ওয়ায়েজীন কেরামও সমান ভাবে ফয়েদা হাছেল করতে পারবেন এবং এলমে দীন প্রসারের কাজে সহযোগিতা লাভ করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ্ !

ওয়ায়েজীন কেরামের প্রতিঃ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"তোমার পরওয়ারদেগারের পথে মানুষকে সুন্দর কথা ও মোলায়েম ভাষায় ডাক এবং তাদের সাথে যুক্তির সাহায্যে আলোচনা কর"।

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াজ করতে নির্দেশ করেছেন।

হযরত থানুবী (রঃ) বলেন, "নবীগণের কাজই ছিল ওয়াজ করা। ওয়াজের জন্যেই তাঁরা প্রেরীত হয়েছেন। তাঁদের পরে তাঁদের ওয়ারিশ হিসাবে আলেমগণ ওয়াজ করবে। কিন্তু আজকাল আলেমগণ এই কাজ থেকে দূরে সরে আছে। ফলে জাহেলরা তাদের স্থান দখল করে নিয়ে ওয়াজ করে বেড়াচ্ছে এবং সরল

মানুষদেরকে গোমরাহ করে বেড়াচ্ছে।"

তাই আলেমগণ ওয়াজ করার দায়িত্ব নিবে। ওয়াজের মধ্যে ওহীর প্রচার থাকবে। যেরূপ থানুবী (রঃ) সহ আমাদের সল্‌ফগণ ওয়াজ করতেন। তাঁরা কোরআন পাকের একটি মাত্র আয়াত তেলাওয়াত করে সেই আয়াতের তফসীর স্বরূপ ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতেন। আর শুধু মাত্র সেই আয়াতের তফসীর স্বরূপ অন্য আয়াত অথবা কোন হাদীস উল্লেখ করতেন। অথবা সমাজে প্রচলিত কোন ঘটনার উল্লেখ করতেন ফলে সেই আয়াতটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট বুঝে এসে যেতো।

হযরত থানুবী (রঃ) এর খলীফা খাজা আযীযুল হাসান মজযূব বলেনঃ

"হযরতওয়ালা কোন বিষয়কে সহজে বোঝানোর জন্যে এমন সব ঘটনার উল্লেখ করতেন যে মনে হতো যেন বিষয়টিকে বোঝানোর জন্যেই ঘটনাটির সৃষ্টি হয়েছে।"

আয়াতের প্রসঙ্গ ছাড়া নিছক গল্প শোনানোর উদ্দেশ্যে কোন গল্প বলতেন না।

সুতরাং এই কেতাবে হযরত থানুবী (রঃ) এর ওয়াজে উল্লেখিত যে সকল গল্প উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র গল্প শোনানোর উদ্দেশ্যে যেন ওয়ায়েজীন কেরাম এইগুলির উল্লেখ না করেন। তাতে শ্রোতাগণ কেবলমাত্র মজা পাওয়ার উদ্দেশ্যে গল্প শুনবে এবং আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল হবে। শুধু মাত্র আয়াত এবং হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ আপনা-আপনি মনে এসে গেলে গল্পের উল্লেখ করবেন।

এই প্রসঙ্গে ওয়ায়েজীন কেরামের প্রতি আরেকটি অনুরোধ যেন তারা বয়ানুল কোরআন সহ বেশী বেশী তফসীর এবং হাদীস পাঠ করেন। ওয়াজের ভিত্তিই হলো তফসীর ও হাদীস।

মিস্‌কীন

মুহাম্মদ রাজি নোমানী

শা'বান ১৪১৮ হিঃ মোতাবেক নভেম্বর ১৯৯৮ ঈঃ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ

বিষয় পৃষ্ঠাঃ

বিষয় পৃষ্ঠাঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানের হাসি

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেনঃ

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ –

" অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (সূরা তৌবা, ৮২ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের অবস্থার ধারাবাহিক বর্ণনার পর এরশাদ করেন যে মুনাফিকদের আনন্দ ও হাসি অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এই আয়াতের তফসীরে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে তফসীরে মাযহারীতেঃ

اَلدُّنْيَا قَلِيْلٌ فَلْيَضْحَكُوْا فِيْهَا مَاشَائُوا فَاذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوا اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوْا الْبُكَاءَ لاَيَنْقَطِعُ اَبَدًا –

" দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থান স্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অত:পর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা উপস্থিত হবে যা' আর নিবৃত্ত হবে না।"

মোটকথা, মুনাফিকদের হাসির প্রতি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারণ তাদের হাসি পরকাল থেকে গাফেল হওয়ার হাসি।

পক্ষান্তরে মুসলমানগণ পরকাল থেকে গাফেল নয়। সর্বদা পরকালের শাস্তির ভয় তাদের অন্তরে বিদ্যমান। এই শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ পাকের এবাদতে নিয়োজিত। তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাছেলের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট। একটি মূহুর্ত এবাদত থেকে গাফেল হলে তাদের অন্তর দুঃখ ও যাতনায় ভরে উঠে। কবির ভাষায় ঃ

بر دل سالك هزاراں غم بود
گر ز باغ دل خلالے كم بود

"মু'মিনের অন্তরে হয় সহস্র দুঃখ,
যদি তার ঈমানের বাগান থেকে একটি কুটা হারায়"

মুসলমান এক মূহুর্ত আল্লাহর এবাদত থেকে গাফেল হতে চায় না। তাই মুনাফিক তথা অমুসলিমের ন্যায় তারা গাফলতির হাসি হাস্তে পারে না। কারণ এই হাসির দ্বারা দিল্ মুর্দা হয়ে যায়। এই হাসির লক্ষণ হলো উচ্চস্বরে হাস্য করা।

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাসি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে হাসতে হয় এবং কতটুকু হাসতে হয়। আর কিভাবে হাসি বিনিময় করে বন্ধু-বান্ধবের হক আদায় করতে হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হাসতেন তাকে মুচ্কি হাসি বলা যেতে পারে। তাঁর হাসিতে (কয়েকটি ঘটনা ছাড়া) জীবনে কখনও দাঁত দেখা যায়নি। যে হাসিতে দাঁত দেখা যায় না সে হাসি কখনও উচ্চস্বরে হয় না। আর এই মুচ্কি হাসিই মুসলমানের হাসি।

এই কিতাবে কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা পাঠকের খেদমতে পেশ করা হলো। এগুলি মুচ্কি হাসির উদ্রেক করবে। আর ইসলামের এমন অনেক জটিল বিষয়কে সহজ করে বুঝিয়ে দিবে যা ঐ ঘটনা ছাড়া বিষয়টি বুঝানো সম্ভব ছিল না।

বিমাতার আদর

জনগণের আরামের জন্যে সরকার সুদের প্রচলন করেছে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় যে সরকার জনগণকে অত্যাধিক আদর করছে। বিনা পরিশ্রমে তাদেরকে (সুদ-নীতিতে) কখনও প্রাইজ (বন্ড); কখনও লাভ, কখনও বোনাস, কখনও ইন্টারেষ্ট নাম দিয়ে রকম-রকম আর্থিক সুবিধা প্রদান করে চলেছে। কিন্তু বিনাশ্রমে এইসব সুবিধা পেয়ে জনগণ যে অলস, অকর্মন্য এবং অক্ষম হয়ে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আত্মার মৃত্যু হয়ে দীনী আগ্রহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছে সেদিকে কেউ লক্ষ্য করছে না। সরকারের মনোভাব হলো সেই স্ত্রীলোকটির মত যে তার সতীনের ছেলেটিকে অত্যাধিক আদর করতো।

অর্থাৎ সেই স্ত্রী লোকটির দুইটি ছেলে ছিল। একটি নিজের ছেলে অপরটি সতীনের ছেলে। সে সতীনের ছেলেটিকে সব সময় কোলে রাখতো। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ছেলেটিকে কখনও কোল থেকে নামাতো না। এমনকি কোলে-কাঁখে নিয়েই সংসারের কাজ-কাম করতো। পাড়ায় বেড়াতে গেলে সতীনের ছেলেটিকে কোলে এবং নিজের ছেলেটিকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতো। পাড়ার মেয়েরা সব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। সবাই বলতে লাগলো, 'মেয়েটির মনে একটুও হিংসা নাই। সতীনের ছেলেকে কোলে আর নিজের ছেলেকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সতীনের ছেলেকে এত আদর করতে আর কোথাও দেখা যায়না। এরূপ সতী-সাধ্বী নারী আর হয় না।'

কিন্তু একদিন পাড়ার একটি মেয়েলোক এসে গোপনে সহানুভূতি স্বরূপ বললো, 'বুবু! নিজের ছেলেকে অবহেলা করে সতীনের ছেলেকে এত আদর করা ঠিক হবে না। তাতে নিজেরই ক্ষতি।'

মেয়েলোকটি বললো, 'না বুবু, এটা আমার ছেলের প্রতি অবহেলা নয়। নিজের ছেলেকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াই যেন তার পা শক্ত হয় এবং

স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে মজবুত হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর সতীনের ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়াই যেন সে কোন দিন হাঁটতে না শেখে। কোলে থাকতে থাকতে অচল এবং পঙ্গু হয়ে কোনদিন সে সমাজে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবেনা। এটা সতীনের ছেলের প্রতি আদর নয়। কিন্ত মানুষ বুঝতে না পেরে আমার প্রশংসা করছে তা আমি কি করবো ?'

ঠিক সেইরূপভাবে জাতি সুদ খেয়ে খেয়ে শ্রম বিমুক হউক; অলস এবং অকর্মন্য হউক, পঙ্গু হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, তা হউক। কিন্তু সরকার অবুঝ লোকদের প্রশংসা পেয়ে ধন্য, গর্বিত এবং আহ্লাদিত।

-- আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৯

গুরুর শিক্ষা

হযরত সুলতান নিজামুদ্দীন (রঃ) এর যামানায় দিল্লীতে এক হিন্দু সাধু বাস করতেন। তিনি এমন এক অনুশীলন করেছিলেন যে রোগীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তার রোগ দূর হয়ে যেতো। একবার হযরত সুলতান নিজামুদ্দীন (রঃ) এর অসুখ হলো। তিনি মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে পড়তেন। হুশ হওয়ার পর খাদেমগণ একবার আরজ করলেন যে যদি অনুমতি দান করেন তবে অমুক সাধুর কাছে হযরতের খাট কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাবো। সে দৃষ্টির মাধ্যমে রোগ দুর করতে পারে।

হযরত বললেন, 'সাবধান! এরূপ করিও না। তাহলে লোকদের আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

কিন্তু পীরের প্রতি মুরীদের মহব্বত হয়ে থাকে এশ্‌ক পর্যায়ের। হযরত যখন আবার বেহুশ হয়ে পড়লেন তখন মুরীদগণ এত পেরেশান হয়ে পড়লেন যে, হযরতের খাট উঠিয়ে সাধুর বাড়িতে হাজির করলেন এবং ভাবলেন এটা হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ায় মাফ চেয়ে এর মীমাংসা করে নেওয়া যাবে।

সাধু দেখলেন এত বড় ব্যক্তিত্ব তার বাড়ীতে এসে উঠেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে গেলেন হযরতের খাটের কাছে এবং দৃষ্টি দিতেই এমনভাবে রোগ দূর হয়ে গেল যে হযরত একেবারে উঠে বসলেন। মনে হলো যেন কোন রোগই ছিলনা। তিনি দেখলেন যে এটা সাধুর বাড়ী। বুঝতে পারলেন, এরা আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাই কেহকে কিছু বললেন না।

বরং তিনি সেই সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মধ্যে এই শক্তি কিসের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে; কোন্ আমলের দ্বারা এই যোগ্যতা অর্জন করেছো, বল দেখি'!

সাধু আরজ করলেন, "আমার মধ্যে শুধু একটি বস্তু আছে যা আমার গুরু আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর সেটা হলো এই যে তিনি বলেছিলেন, 'সব সময় নফসের বিরুদ্ধে চলিও; অর্থাৎ তোমার মন যে কাজটি করতে চায় সে কাজটি করিও না আর যে-কাজটি করতে চায়না সেই কাজটি করিও।' এই একটি মাত্র অভ্যাসের দ্বারা আমার নফসের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা আমি 'তাছাররুফ' করে রোগ দুর করে দিই।"

এই কথা শুনে হযরত সুলতানজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বল দেখি তোমার কি মুসলমান হতে মন চায় ?"

সাধু আরজ করলেন, 'না, সেটা চায়না'

হযরত বললেন, "তাহলে তোমার গুরুর শিক্ষার উপর আমল হয় কৈ ?"

সাধু চিন্তায় পড়ে গেল।

এদিকে হযরত উপকারের বদলে উপকারের চিন্তায় দোয়া করতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ্, সে আমার উপকার করেছে, আমিও তার উপকার করতে চাই। সে আমার শরীরের রোগ দূর করেছে আমি তার রূহানী রোগ কুফুরী দূর করতে চাই। তুমি সাহায্য কর।'

সাধু আর ঠিক থাকতে পারলেন না, একটি ঘুর্ণিঝড় খেলে গেল তার অন্তরে। সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলোঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه

সুতরাং উপকারের বদলে উপকার বাস্তবায়িত হলো। সাধু মুসলমান হয়ে ঈমানের সৌভাগ্য লাভ করলেন।

-- আলএফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ৪. পৃষ্ঠা ২০৩ ।

যিন্দা লাশ

অনেক 'পীর' আছেন যারা নিজের দলে লোক ভিড়াবার জন্যে নানা রকম ফন্দি এঁটে থাকেন। এরূপ একজন পীর নিজের পীরত্ব প্রচারের জন্যে এক কৃত্রিম কেরামতির অবতারণা করলেন। তিনি সেজে গুজে এক নতুন রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তার 'শিষ্য'কে কাফনের কাপড় পরিয়ে লাশ-বাহী খাটে শোয়ালেন। মরা-কান্না কাঁদবার জন্যে কয়েকজন লোক নিযুক্ত করলেন। এরপর জানাযা পড়ার জন্যে লোকজন ডাকা হলো। বিশাল জনতা যখন জানাযা পড়ার অপেক্ষা করছে তখন পীর সাহেব হঠাৎ করে খাটের কাছে আবির্ভূত হলেন এবং লাশকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

قُمْ بِإِذْنِ الله (কুম বে- ইয্‌নিল্লাহ্)

'আল্লাহ্র ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াও।'

শোনা মাত্রই লাশটি কাফনের কাপড় ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হাত তুলে জনতাকে সালাম জানালো।

সরলমনা জনগণ পীরের এই কেরামতি দেখে চারিদিকে ডঙ্কা বাজিয়ে দিল। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভীড় করতে লাগলো। রাজ্যের রাজাও এই নবাগত পীরের কাহিনী শুনতে পেলেন। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। পীরকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন।

পীর সাহেব মনে মনে ভাবলেন তার কৌশলটি বৃথা যায়নি। রাজাও তার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি খুশীমনে রাজার দরবারে হাজির হলেন।

রাজা বললেন, "যুদ্ধে আমার সেনা-বাহিনীর অনেক লোক মারা যায়। ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। কারণ ঐরূপ ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈন্য আর পাওয়া যায় না। আপনি এ দেশেই থাকুন। ওদেরকে যিন্দা করাই আপনার কাজ। আপনার ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় খরচ-পত্র আমরা বহন করবো।"

রাজার কথা শুনে পীর সাহেবের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তিনি দুই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন এবং সুযোগ বুঝে অতি গোপনে রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালালেন।

-- আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫৫।

পাঠক এবার প্রকৃত পীরের সংজ্ঞা জেনে নিন। পীরের ব্যক্তিত্বে নিম্নলিখিত গুণ অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

১। আলেম হতে হবে। আলেমের সংজ্ঞা হলো - কমপক্ষে তিনটি কেতাব এমনভাবে শিক্ষা করতে হবে যেন তা' সুন্দরভাবে ছাত্রদেরকে পড়াতে পারেন এবং ছাত্ররা তার পড়াবার যোগ্যতার পক্ষে স্বাক্ষী দিবে। কেতাব তিনটি হলো (ক) তফসীরে জালালাইন, (খ) মেশকাত শরীফ এবং (গ) হোদায়া(উভয় খন্ড)।

২। প্রত্যেক ফরয, ওয়াজেব এবং সুন্নতের পূরাপুরি পাবন্দ থাকবে এবং হারাম ও মকরূহ কাজ সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবে।

৩। মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য অপর এমন একজন পীর কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে যার পর্যায়ক্রমিক পীরের প্রথম পীরটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

আর সেই পীরের দরবারে আলেমগণ যান কিনা দেখতে হবে। কারণ পীরের স্থান আলেমের উর্দ্ধে। আলেম হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পীরের সান্নিধ্যে থেকে 'এছলাহ্' লাভের জন্য সাধনা করতে হয়। এই জন্য আলেমগণও প্রকৃত পীরের দরবারে গিয়ে উপকৃত হন। মুরীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা দুনিয়ার কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ইচ্ছা থাকেনা প্রকৃত পীরের। তিনি ইচ্ছাকৃত কোন 'কেরামত' প্রকাশ করেন না। এমনকি যদি অনিচ্ছাকৃত তার থেকে কোন কেরামত প্রকাশ হয়ে যায় তবে তিনি

মনে কষ্ট পান। তাঁর মজলিসে বস্‌লে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগরিত হয়, পরকালের কথা মনে পড়ে যায় এবং অন্তর অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠে।

সূত্র ঃ যিয়াউল কুলূব ও কছদুস সাবীল

চোর দরবেশ

গুনাহ্ ছাড়। এবাদত শুরু করে দাও। তারপর দেখ অন্তরের মধ্যে কত রকম শান্তি ও সুখের ধারা প্রবাহিত হয়। আল্লাহপাকের এবাদত এমন এক আশ্চর্য জিনিষ যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তা সম্পন্ন হয়ে যায় তবু তার সুফল পাওয়া যায়। যেমন কাপড় যদি ভুল করেও রঙের মধ্যে পড়ে যায় তবু তাতে রং লেগে যাবে। বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে একটি চোরের ঘটনা থেকে।

এক বাদশাহ ছিলেন। তার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। এক চোর সেই কন্যার উপর আশেক ছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ছিল।

ঘটনাক্রমে একদিন সে চুরি করার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্র ঘরে প্রবেশ করলো। তখন বাদশাহ এবং বেগম তাদের মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন।

বাদশাহ্ বললেন, 'আমাদের মেয়ের বিবাহ দিব আল্লাহওয়ালা পরহেজগার লোকের সাথে।'

চোর এই কথা শুনে চুরি করা ভুলে গেল এবং বাদশাহ্র সিদ্ধান্তের কথাকে এক বিরাট গণীমত মনে করলো যে তার প্রিয়তমাকে পাওয়ার সঠিক ব্যবস্থা জানা হয়ে গেছে। এখন পরহেজগার হয়ে যাওয়াই ভাল।

বাদশাহ্র ঘর থেকে বাহির হয়ে সে এক মসজিদে গিয়ে বসলো এবং রাত দিন আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে পড়লো। ফলে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে একজন খুব বড় দরবেশ এসেছে।

এদিকে বাদশাহ্ তার শাহযাদীর বিবাহের পাত্র খোঁজার জন্যে লোক লাগিয়ে দিলেন। পরহেজগার পাত্র খোঁজার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটলো। অনেক খোঁজাখুজির পর অবশেষে জানা গেল যে, অমুক মসজিদে এমন এক আল্লাহওয়ালা আছেন যার চেয়ে অধিক মুত্তাকী সারাদেশে আর একটিও নাই।

সুতরাং বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিবাহের পয়গাম নিয়ে বাদশাহ্র দূত তার কাছে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু চোরের কাজ ততদিনে সারা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র এবাদতের শান্তিতে তার অন্তর এত ভরপূর হয়ে উঠেছিল যে, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধনও তার কাছে তখন তুচ্ছ মনে হতে লাগলো।

সে দূতকে বললোঃ আপনারা যান, আমার সময় নষ্ট করবেন না।

-- তাসহীলুল মাওয়ায়েজ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯।

এ প্রসঙ্গে সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন ঃ

تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ لِلّٰهِ –

এলেম শিখেছিলাম গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, অতঃপর এলেম অস্বীকার করলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে হতে ।

কলস ভর্তি সোনা

আগেকালের উম্মতের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক অতিক্রম করে গেছেন। হাদীস শরীফে এরূপ একটি ঘটনা রয়েছেঃ

এক ব্যক্তি তার বাড়ী বিক্রী করেছিল। খরিদ্দার বাড়ী দখল করার পর সেখানে (মাটির নীচে) সোনা ভর্তি একটি কলস পেয়ে গেল। তখন সে

কলসটি নিয়ে বাড়ী বিক্রেতার কাছে গিয়ে বললো, "ভাই আপনার কলস নিন। কলসটি আপনার বাড়ীতে পাওয়া গেছে।"

বিক্রেতা বললো, "আমি তো বাড়ী আপনার কাছে বিক্রী করে দিয়েছি। সুতরাং এই কলসটি আমার হয় কিভাবে ? আপনি বাড়ী খরিদ করেছেন। সুতরাং বাড়ী আপনার এবং কলসও আপনার।"

লোকটি বললো, "তা' হয় না। আমি বাড়ীর জন্যে টাকা দিয়েছি, কিন্তু কলসের জন্যে কোন টাকা দেইনি। সুতরাং কলস আপনারই হবে।"

অতঃপর আইনতঃ কলসটি যারই হউক এই ঘটনা থেকে তাদের এখলাছের এক জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ আমাদেরকেও ঐরূপ হতে হবে। তাহলে আমাদের মধ্যে কোন গীবত থাকবে না, ঝগড়া থাকবে না, মামলা-মকদ্দমা থাকবে না, শুধু থাকবে পরস্পর এখলাছ ও ভালবাসা। আর আল্লাহর রহমত ও শান্তির অফুরন্ত প্রবাহ।

-- তাসহীলুল মাওয়ায়েজ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭

শবে বরাতে দুই ব্যক্তির কীর্তি

কানপুরের ঘটনা। দুই ব্যক্তি শুনতে পেয়েছিল যে শবে বরাতে যে-দোয়া করা হয় তা' কবুল হয়। সুতরাং দুইজনে একটি মাটির ঢেলা নিয়ে বসে গেল। ঢেলাটি একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে নিল। তারপর দোয়া করতে লাগলো, "হে আল্লাহ! আমরা গরীব মানুষ, এই ঢেলাটি যেন সোনা হয়ে যায়। শবে বরাতে তুমি দোয়া কবুল করে থাক। আজ শবে বরাত। সুতরাং আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না"।

সারা রাত ধরে দোয়া করলো। সকাল যতই ঘনিয়ে আসছিল তাদের দোয়ার জোর ততই বেড়ে যাচ্ছিল। রুমালের নীচের ঢেলাটি সোনা হয়েছে

কিনা দেখার আগ্রহও বেড়ে যাচ্ছিল। অতঃপর অতি কষ্টে যখন সকাল হলো তখন রুমাল খুললো। দেখে সেই মাটির ঢেলাটিই পড়ে আছে। সকল আশা আকাঙ্খা ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। মনটা এতটুকু হয়ে গেল, এই ভেবে যে শবে বরাত সারাটাই বৃথা হয়েছে। মনের মধ্যে নানারকম শয়তানী খেয়াল ভীড় করতে লাগলো -- শবে বরাতে দোয়া কবুল হয়, আজ শবে বরাত ছিল, কিন্তু কিছুই তো হলো না। তাহলে যা-কিছু শুনেছিলাম সবই কি মিথ্যা ?

দুই জনকে চিন্তাক্লিষ্ট বসে থাকতে দেখে এক দর্জী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে এসে দাঁড়াল। লোকটি আলেমদের ছোহবত পেয়েছিল তাই তাদের ঈমান বরবাদ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করলো, "কি হয়েছে ভাই, আপনারা এখানে এত চিন্তিত বসে আছেন কেন ?"

তখন তারা বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললো। এই শুনে লোকটি বললো ঃ "ভাই, আপনারা আল্লাহ্ পাকের শুকুর করেন। এর পিছনে তাঁর অনেক হেকমত রয়েছে। তার মধ্যে একটি আমার বুঝে এসেছে। তা'হলো এই যে আল্লাহ্ আপনাদেরকে মহব্বত করেন। তাই আপনাদের জীবন রক্ষা করেছেন। তিনি যদি এই মাটির ঢেলাকে সোনা বানিয়ে দিতেন তবে তার ভাগাভাগি নিয়ে এখনই ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যেতো। এরপর শুরু হতো মারামারি, তারপর মাথা ফাটতো এবং অবশেষে একজন নিহত হতো, অপর জনের বিচারে ফাঁসি হতো। ফলে দুই জনেরই মৃত্যু হতো এবং সোনার পিন্ড তার জায়গায় পড়ে থাকতো। সুতরাং আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।"

এই কথা শুনে লোক দুইটি খুব খুশী হলো এবং আল্লাহ্র শুকুর গুযারী করলো।

সুতরাং হক্কানী আলেমদের ছোহবত পেলে যেমন নিজের ঈমান রক্ষা হয় তেমনি অন্যের ঈমান রক্ষা করতে সাহায্য করা যায়।

-- তাসহীলুল মাওয়ায়েজ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭।

বিনা পরিশ্রমের ব্যবসা

এক বুযুর্গের একটি ঘটনা আছে। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রায়ই গালি দিত। যতবার গালি দিত বুযুর্গ ততবার তার বাড়ীতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন লোকটি ভাবলো তিনি তো আমার উপকারই করছেন সুতরাং তাঁকে গালি দেওয়া উচিৎ নয়। এই ভেবে সে গালি দেওয়া বন্ধ করে দিল।

সেই দিন থেকে বুযুর্গও তাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুযুর্গ বললেন, "ভাই, ব্যবসায়ের তো এটাই নিয়ম। দিতে হবে এবং নিতে হবে। তুমি এতদিন আমাকে মাল দিয়েছো, আমি তার বদলে তোমাকে টাকা দিয়েছি। এখন তুমি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছো তাই আমিও দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

লোকটি বললো, 'কৈ, আমি তো কখনও আপনাকে কোন কিছু দিতাম না!'

বুযুর্গ বললেন, 'তুমি যতদিন আমাকে গালি দিয়েছো ততদিন তোমার এবাদতের সওয়াব আমি পেতাম। বিনা পরিশ্রমে আমার অনেক সওয়াব জমা হতো। এখন তুমি গালি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ ফলে আমার আর সেই উপকার হয় না। তাই আমিও তোমার উপকার করা বন্ধ করে দিয়েছি।'

-- আল এফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ্ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৮৬

দরবেশ ও বাঘ

ইংরেজগণ এই উপমহাদেশের একটি অকৃতজ্ঞ জাতিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। আর অপর একটি কৃতজ্ঞ জাতিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছিল; কিন্তু এর ফল যা হয়েছিল তা দেখে পরবর্তী কালে এই ইংরেজগণ শত আফসোস আর দুঃখ করেছে।

এক উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজ হাকিম গোরক্ষপুরে সফরে গিয়েছিলেন। সেখানকার জমিদারের ম্যানেজারের কাছে এ প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ করে একটি ঘটনা বলেছিলেন। ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ ঃ

নির্জন কক্ষে এক দরবেশ বাস করতেন। সেই কক্ষে এক ইঁদুর এসে বাচ্চা প্রসব করলো। পরে দরবেশকে দেখতে পেয়ে সব কয়টি পালিয়ে গেল। কিন্তু একটি ইঁদুরের বাচ্চা রয়ে গেল। বুযুর্গের দয়া হলো। তিনি বাচ্চাটিকে দুধ ইত্যাদি পান করাতে লাগলেন। একদিন দেখলেন বাচ্চাটি মন ভার করে বসে আছে। তিনি তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বাচ্চা বললো "আজ একটা বিরাট ইঁদুর আমাকে ধাওয়া করেছিল, আজ কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছি; কিন্তু একদিন সে আমার উপর জয়ী হবে এবং আমার প্রাণ বধ করবে। তাই আমার দুঃখ।"

বুযুর্গ বললেন, "তাহলে আমি এখন তোর জন্যে কী করতে পারি?"

সে বললো, "আমাকে বিড়াল বানিয়ে দিন। "

বুযুর্গ তখন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এবং তার শরীরে হাত বুলালেন সঙ্গে সঙ্গে সে একটি বিড়ালে পরিণত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর দরবেশ দেখলেন বিড়ালটি বিমর্ষ মনে বসে আছে। তিনি আবার তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বিড়াল বললো, "আজ মহল্লার গলিতে গিয়েছিলাম। এক কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল। বড় কষ্ট করে প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছি। কিন্তু এভাবে কতদিন প্রাণ বাঁচাতে পারবো; তাই আমি চিন্তিত।"

দরবেশ বললেন "তাহলে তুই এখন কী চাস?"

বিড়াল বললো "আমাকে কুকুর বানিয়ে দিন ।"

বুযুর্গ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং বিড়ালের গায়ে হাত বুলালেন অমনি বিড়াল কুকুর হয়ে গেল।

পাঁচ সাত দিন পর দেখলেন কুকুরটি বিষন্ন মনে বসে আছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কুকুর বললো, "আজ আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম সেখানে একটি নেকড়ে আমার উপর হামলা করেছিল।"

বুযুর্গ বললেন, "তাহলে তুই এখন কী চাস ?"

সে বললো, "আমাকে নেকড়ে বানিয়ে দিন।"

বুযুর্গ দোয়া করে তার উপরে হাত বুলালেন। আর অমনি কুকুরটি নেকড়ে হয়ে গেল।

কয়েক দিন পর দেখলেন আবার সে মন খারাপ করে বসে আছে।

বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, "মন খারাপ হওয়ার কারণ কী ?"

সে বললো, "আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম সেখানে একটি বাঘ আমাকে ফেড়ে খাওয়ার জন্যে তাড়া করেছিল।"

বুযুর্গ বললেন, "এখন তবে তুঁই কী চাস ?"

সে বললো "আমাকে বাঘ বানিয়ে দিন।"

দরবেশ আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করে তার গায়ে হাত বুলালেন তখন সে একটি বাঘ হয়ে গেল। বাঘ হয়ে সে মনের আনন্দে জঙ্গলে গেল। জঙ্গলে যেতেই আগের সেই বাঘটি তাকে দেখে বলে উঠলো "আরে বহুরূপী! খুব রূপ বদলিয়েছিস বটে, কিন্তু তোর মধ্যে আর আমার মধ্যে এখনও পার্থক্য রয়েছে। তুঁই হলি মানুষের তৈরী বাঘ, আর আমি হলাম আল্লাহর তৈরী বাঘ। (দরবেশের তাছাররুফের মধ্যেমে তৈরী বাঘ আর) আল্লাহর তৈরী আসল বাঘের ক্ষমতা এখনই পরীক্ষা হবে। হাকীকত এখনই খুলে যাবে দাঁড়া!"

এই কথা শুনে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "তাহলে আমার প্রাণে বাঁচার কি কোন পথ নাই ?"

বাঘ বললো, "একটি মাত্র পথ আছে। আগে তুঁই তাকে খতম করে আয় যে খোদার উপর খোদকারী করেছে, তোকে ইঁদুর থেকে বাঘ বানিয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যে হস্তক্ষেপ করেছে তাকে খতম করলেই তোকে ছাড়বো।"

সে চললো। জঙ্গল থেকে দরবেশের কামরায় এসে উপস্থিত হলো। বুযুর্গ দেখলেন সে নখ বাহির করে থাবা প্রস্তত করে সামনে এসে ঘড় ঘড় করছে।

তিনি বললেন, "আজ তোর এ কি অবস্থা ?"

সে বললো, "আজ তোমাকে খাবো।"

বুযুর্গ বললেন, "আমার আগের সকল দয়া এবং উপকারের কথা কি ভুলে গেছিস?"

সে বললো, "ধেৎ তোর উপকার! এখন আমার জান যায়, উপকারের কথা ভেবে জান হারাতে পারি না। সেই বাঘের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। সে হলো আসল বাঘ। আর আমি যে ইঁদুর থেকে বাঘের রূপ ধরেছি তা সে জানতে পেরেছে। আমাকে বলেছে, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে যে হস্তক্ষেপ করে তোকে ইঁদুর থেকে বাঘ বানিয়েছে তাকে খতম করে আয় না হলে তোর রক্ষা নাই।"

বুযুর্গ বলেলেন, "ও আচ্ছা এই কথা ? ঠিক আছে তুমি বস, স্থির হও। তোমার জান রক্ষা হবে। আমি ব্যবস্থা করছি।"

তখন এই বাঘ স্থির হয়ে বসলো। বুযুর্গ সুযোগ পেয়ে দোয়া করলেন এবং তার গায়ে হাত বুলালেন। অমনি বাঘ আবার ইঁদুর হয়ে গেল। সকল বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে আবার শান্তি ফিরে আসলো।

এই ঘটনা ব্যক্ত করে সেই হাকিম সাহেব বললেন, "এটা আমাদেরই দোষ যে আমরা এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে অগ্রসর করতে করতে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি যেখানে দাঁড়িয়ে আজ তারা আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহার করে চলেছে। এই জাতিটি বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞ।

সুতরাং এই ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

-- আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৯৮

কসম খাওয়ার বিভ্রাট

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে কসম খেয়ে বললো, "যদি তোর সাথে আমি আগে কথা বলি তবে তুঁই তালাক।"

স্ত্রীও অভিমান করে কসম করলো, 'যদি আমি আগে কথা বলি তবে

আমার অমুক গোলাম আযাদ।'

দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কেউ কারো সাথে কথা বলে না। ফলে সংসার অচল। স্বামী আগে কথা বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং সংসারকে রক্ষা করতে স্বামী চিন্তায় পড়ে গেল।

অপর দিকে স্ত্রী আগে কথা বললে তার মূল্যবান গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে, সুতরাং সেও গোলাম হারাতে রাজী নয়।

লোকটি কসম খাওয়ার দরুণ আফসোস করতে লাগলো এবং পেরেশান হয়ে আলেমদের কাছে দৌড়াল কিভাবে স্ত্রীর সাথে কথাও বলা যায় এবং তালাকও না হয়।

আলেমগণ সবাই একবাক্যে বলে দিলেন স্ত্রীর সাথে আগে কথা বললে তালাক হওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। আবার স্ত্রী আগে কথা বললে গোলাম আযাদ হওয়া ছাড়া কোন পথ নাই। সুতরাং হয় স্ত্রীর তালাক, না হয় গোলাম আযাদ এই দুই পথ ছাড়া আর কোন পথ নাই।

আলেমদের দৃঢ় বক্তব্য শুনে লোকটির পেরেশানী আরও বেড়ে গেল। অবশেষে তার মনে পড়ে গেল ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কথা। সে তাঁর সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হলো। ইমাম আযম (রঃ) লোকটির সকল কথা শুনে বললেন, 'যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল। কোন ভয় নাই, তালাক হবে না।'

এই কথা শুনে সকল আলেম বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন।

সবাই বলতে লাগলেন, 'তাঁকে আমরা সর্বোচ্চ জ্ঞানী ভাবতাম। অথচ তিনি এই নীতি-জ্ঞানহীন ফতোয়া কিভাবে দিলেন! তালাকের কর্ম হওয়ার পরও কিভাবে তালাক হয় না?'

আলেমগণ অবশেষে তাঁর কাছে এসে এইরূপ ফতোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ইমাম আযম জওয়াব দিলেন, 'স্বামীর কসম খাওয়ার পর পরই স্ত্রী স্বামীকে সম্বোধন করে কসম খাওয়াতে স্ত্রীর কথা বলা হয়ে গেছে। সুতরাং এখন স্বামী কথা বললে স্ত্রীর পরে কথা বলা হবে। সুতরাং তালাক হবে না। স্বামী এখন কথা বলার পর স্ত্রী কথা বলবে তাতে স্ত্রীরও গোলাম আযাদ

হবে না।'

ইমাম আযমের জ্ঞানের এই গভীরতায় সবাই তলিয়ে গেলেন। তাদের আর কোন কথা শোনা গেল না।

-- আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৫।

সাপের তৌবা

আমার কাছে যারা তালীম গ্রহণ করতে আসে প্রথমেই আমি কাউকে তিরস্কার করি না। মানুষ যখন আমাকে সুঁই ফোটায় তখন আমি 'উহ!' করে উঠি মাত্র। সেই শব্দটি শোনা যায়। আর যে-লোকটি আমাকে সুঁই ফুটালো তার শব্দটি শোনা যায় না। ফলে লোকে ভাবে আমি জালেম আর লোকটি মজলুম। এভাবে লোকে মজলুমকে জালেম আর জালেমকে মজলুম মনে করে থাকে।

তিরস্কার না করার দরুণ আমার যে-অবস্থা হতে পারে তা' নীচের ঘটনাটির দ্বারা অনুমান করা যায়।

এক সাপ তার জীবনে কতবার দংশন করেছে আর আল্লাহ্র কত মাখলুককে কষ্ট দিয়েছে সেই চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়লো। এখন তৌবা করে ভাল হয়ে যাবে এই চিন্তা করে সে এক পীরের কাছে গিয়ে মুরীদ হলো এবং তৌবা করলো যে আর কখনও কাউকে কামড়াবে না।

একথা সমস্ত বন-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লো যে সাপটা পীরের কাছে মুরীদ হয়েছে এবং আর কাউকে কামড়াবে না বলে তৌবা করেছে। সব জন্তু নিরাপদ হলো। ব্যাঙ এসে তার পীঠে বসে থাকে, ইঁদুর এসে লেজ কামড়িয়ে টানাটানি করে। আর সে ছবর করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে তার মাংসের কণা ছিঁড়ে নিয়ে উড়ে যায়। সে ছবর করে। পিঁপড়ার দল মনের আনন্দে তার দেহ ফুটা করে রক্ত শুষে নেয়। সে ছবর করে। একদিন পীর সাহেব সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন সাপটির দেহ

ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী অবস্থা তোর?'

সাপ বললো, 'হুজুর! এসব আপনার মুরীদ হওয়ার বরকত। জঙ্গলের জন্তুরা আমার তৌবা করার কথা শুনে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে জুলুম করে চলেছে। কিন্তু আমি যে তৌবা ভঙ্গ করতে পারি না, তাই ছবর করে চলেছি।'

পীর সাহেব ফরমালেন, 'আরে নাদান! তোকে আমি ছোবল মারা থেকে তৌবা করিয়েছিলাম; ফোঁস করা থেকে তো তৌবা করাইনি? প্রয়োজন বোধে ফোঁস করে উঠিস। নিজের হেফাজতের জন্যে মাঝে মাঝে ফোঁস করে উঠার দরকার আছে।'

আমিও সেইরূপ মানুষের বিশৃঙ্খল আচরণ থেকে বাঁচার জন্যে ফোঁস করে দিই। যদি এইরূপ না করি তবে চারিদিক থেকে লোকে আমাকে এভাবে ঘিরে ধরবে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে থাকবে।

-- আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫৫।

শিয়া সাহেবের চুমা-চাটা

জালালাবাদে একবার হুযুর পাক্ (দঃ) এর কথিত জুব্বা মুবারক এর প্রদর্শনী হচ্ছিল।

সেখানে কোরআন শরীফের এমন একটি কপিও প্রদর্শিত হচ্ছিল যা' হযরত আলী (রাঃ)-এর স্বহস্তে লিখা বলে কথিত ছিল।

দর্শনপ্রার্থীদের অনেক ভীড় ছিল সেখানে। সবাই বড় আগ্রহ এবং মহব্বতের সাথে জুব্বা মুবারক দেখছিল। কারণ সেটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সংগে সম্পর্কিত ছিল।

কিন্তু একজন শিয়া ভদ্রলোককে ব্যতিক্রম দেখা গেল। তিনি জুব্বা মুবারকের প্রতি আগ্রহী না হয়ে সেই কোরআন শরীফের দিকে এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন যে চুমা-চাটা শুরু করে দিলেন। জুব্বার প্রতি ভ্রূক্ষেপও

করলেন না।

এক সুন্নী ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এই কোরআন শরীফের দিকে খুব মনোযোগী হয়ে পড়েছেন দেখছি!'

শিয়া সাহেব বললেন, 'এই কোরআন শরীফ আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী আলাইহিস্ সালামের পবিত্র হাতের লিখা যে তাই।'

সুন্নী সাহেব বললেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এটা আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর নিজ হাতের লিখা?'

শিয়া সাহেব বললেন, 'এতে কোন সন্দেহ নাই।'

তখন সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। শিয়া সাহেব সবার সামনে কয়েকবার একথা স্বীকার করলেন যে সেই কোরআন শরীফটি হযরত আলী (রাঃ) এর নিজ হাতের লিখা।

সুন্নী সাহেব সমাবেশকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তাহলে আজ শিয়া এবং সুন্নী মতবাদের ফয়সালা হয়ে যাক, হকের উপর কা'রা আছে। এই কোরআন যখন হযরত আলী (রাঃ) এর নিজ হাতে লিখা তখন দেখে নিন এটা সুন্নীদের কোরআনের মত, না শিয়াদের কোরআনের মত। কারণ তোমরা বলছো– কোরআন চল্লিশ পারা নাজিল হয়েছিল, সুন্নীরা দশ পারা গোপন করেছে। সেই দশ পারা হযরত আলী (রাঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের কাছে তা' আছে। তাহলে তোমাদের কাছে যে কোরআন আছে তা' এই স্বহস্তে লিখিত হযরত আলী (রাঃ) এর কোরআনের সাথে অবশ্যই মিলে যাবে!'

কিন্তু এই কথা শুনে দুই কোরআনকে মিলিয়ে দেখার আগেই শিয়া ভদ্র লোকের মুখ শুকিয়ে গেল, তার খাঁচার পাখী উড়ে গেল, বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগলো। কারণ আলী (রাঃ) এর নিজ হাতে লিখা কোরআনেও তারা চল্লিশ পারা দেখাতে পারবে না। অতিরিক্ত অংশ তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। পবিত্র কোরআনকে না মানার একটা বাহানা মাত্র এটা।

-- আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ; খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪।

বেদআতী মোল্লা সমাচার

বেদআতীদের মধ্যে দীনী শিক্ষাও থাকে না দীনও থাকে না। ভিত্তিহীন অনেক কথা আবিষ্কার করে নিয়ে সেগুলি হেঁকে বেড়ায়। যাতে অজ্ঞ লোকদের মধ্যে সহজে প্রভাব বিস্তার করা যায়। উদ্দেশ্য হলো হালুয়া-মিঠাই। রসনার তৃপ্তির জন্যেই এই সকল নষ্টামি চলছে। এরা নিজের দীনকে খারাব করেছে এবং মানুষকেও গোমরাহ্ করেছে।এরূপ এক বেদাআতীর ঘটনা শোনা গেছে এক গ্রামে।

সেখানে একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদে এক মোল্লা থাকতো। এক বুড়ি সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে মোল্লার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসলো। ঘটনাক্রমে তখন মসজিদে মোল্লা ছিল না। এক মুসাফির সেখানে অবস্থান করছিল। বুড়ি প্রথমে মোল্লা মোল্লা করে আওয়াজ দিল। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ভাবলো– খাবার খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হলো সওয়াব লাভ করা। এই মুসাফিরকে দিলেও তো সওয়াব হবে। ঠিক আছে এই মুসাফিরকেই দিয়ে দিই। এই ভেবে খাবারগুলি মুসাফিরকে দিয়ে ফিরে চললো।

মসজিদ থেকে বাহির হতেই দেখলো দরজায় মোল্লা এসে গেছে। বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি জন্যে এসেছিলে ?'

স্ত্রীলোকটি বললো, 'কিছু খাবার জিনিষ এনেছিলাম তোমাকে না পেয়ে মুসাফিরকে দিয়ে যাচ্ছি।'

এই কথা শোনা মাত্রই মোল্লা সাহেবের গায়ে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। ভাবলো, এ দেখি এক নতুন রাস্তা খুলতে যাচ্ছে। এখানেই এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। নাহলে আমার অস্তিত্ব বিলীন হবে।

সুতরাং সে মসজিদে এসে হাতে একটি লাঠি নিয়ে মেঝেতে সজোরে বাড়ি কষতে লাগলো। সারা মসজিদে পাগলের মত ছোটাছুটি করে লাঠির আঘাত করতে করতে অবশেষে ধড়াম্ করে পড়ে গেল এবং মেঝেতে

হাত-পা শাট করে শুয়ে থাকলো।

'কি হলো, কি হলো' বলে সারা গ্রামের লোক মসজিদে ভেঙে পড়লো। মোল্লাকে ধরাধরি করে টেনে তুললো। এরপর জিজ্ঞাসা করলো, 'কী হয়েছে মোল্লাজী, তোমার কী হয়েছে?'

মোল্লা বললো, 'এই গ্রামে আর আমার থাকা হবে না।'

গ্রামের লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

সে বললো, 'আমি এখানকার সব মুর্দাকে চিনি। মুসাফির সবাইকে চেনে না। তাই খাবার বিতরণ করার সময় অন্য গ্রামের মুর্দাদেরকে দিয়েছে, প্রকৃত হকদার কিছুই পায়নি। মুসাফির বুঝতে পারেনি বলে তাকে কিছু বলেনি। কিন্তু যখন আমি আসলাম তখন সকল মুর্দা আমাকে ঘিরে ধরলো। এত ভয় দেখালাম, এত লাঠি মারলাম আর বললাম, যখন আমার হাতে দেয়ইনি তখন তোমাদেরকে আমি দিব কিভাবে? কিন্তু আমার একটি কথাও শুনলো না, সবাই মিলে আমাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে বুকের উপর চড়ে বসলো। তোমরা যদি এসে না ধরতা তবে আমার প্রাণ বধ করে ছাড়তো। কিন্তু তোমরা এভাবে আমাকে কতদিন রক্ষা করবা। তাই এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।'

বেচারা গ্রামবাসী একেবারে অসহায় হয়ে পড়লো।

অতঃপর সবাই একমত হয়ে বললো, 'কোথাও যেয়ো না, এখন থেকে তোমার হাতেই সব খাবার দেওয়া হবে।'

এইসব ভিত্তিহীন কথায় লোকগুলিকে বশ করে নিজের উদ্দেশ্য হাছিল করে নিল বটে, কিন্তু একটুও ভাবলো না যে এই লোকগুলি এরূপ বিশ্বাসের দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে না-কি গোমরাহীর গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

এই সকল জাহেল বেদআতী মোল্লাদের কারণেই এরা অনেকের দৃষ্টিতে তুচ্ছ এক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নীচের ঘটনা ঃ

ক্ষীর খাওয়ার বিড়ম্বনা

এক স্ত্রীলোক কিছু ক্ষীর রান্না করেছিল। সবাই খাওয়ার পর বেঁচে থাকা ক্ষীরগুলি উঠানের এক কোণায় একটি পাত্রে রেখে দিল। অতঃপর তার ছোট ছেলেটিকে বললো, 'যা, এগুলি মসজিদের মোল্লাকে দিয়ে আয়।'

ছেলেটি যখন সেগুলি নিয়ে গেল তখন, কতকাল পরে না-জানি মোল্লা ক্ষীর দেখতে পেয়েছিল; তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে নিয়েই খেতে শুরু করে দিল।

ছেলেটি বললো, মোল্লাজী ওপাশ থেকে খাবেন না, ও পাশে কুকুর খেয়েছে।'

এই কথা শুনে মোল্লাজী ঘৃণা এবং রাগে হাত থেকে পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাত্র ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। ছেলেটি ভয়ে কাঁদতে লাগলো।

মোল্লা জিজ্ঞাসা করলো, 'কাঁদছিস কেন ?'

বললো, 'বাসনটি ভেঙে ফেললেন, মা আমাকে মারবে।'

মোল্লা বললো, ' কুকুরে খাওয়া বাসন ভেঙে গেছে তো তাতে তোর মা মারবে কেন ?'

ছেলেটি বললো, 'ওটা আমার ছোট ভায়ের গু' ফেলা পাত্র।'

— আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১২১।

যার নাই উস্তাদ তার উস্তাদ শয়তান

সাধারণ লোকেরা কোরআন শরীফের বাংলা তরজমা নিজে নিজেই পড়ে থাকে। কোন উস্তাদের কাছে যায় না। ফলে এই গভীর জ্ঞান-সাগর পাড়ি দেওয়ার কৌশল জানা না থাকার কারণে নানা রকম সন্দেহে পতিত হয়। আবার এই সন্দেহ দূর করার জন্যে কোন মোহাক্কেক আলেমকেও জিজ্ঞাসা করে না ফলে সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে একদিন ঈমান বরবাদ করে বসে। দেখুন বাংলায় জ্যামিতির বই আছে। সেখানে জ্যামিতির চিত্রগুলি বাংলা ভাষায় পড়ে কেন বুঝতে পারে না ? বলা বাহুল্য, সেখানে উস্তাদের দরকার হয়। উস্তাদ ছাড়া সেখানে ভুল করা অবশ্যম্ভাবী। এমন কি মানব রচিত কবিতার ছন্দও নিজে নিজে পড়তে গিয়ে ভুল করে ফেলে।

যেরূপ এক ব্যক্তি নীচের ছন্দটি পাঠ করে তার অর্থ এত ভুলভাবে গ্রহণ করেছিল যে তার বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে মারাত্মক বিপদে ফেলেছিল। ছন্দটি এইরূপ ঃ

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست

در پریشاں حالی و در ماندگی

"সেই হলো বন্ধু যে বিপদে-পড়া বন্ধুর হাত ধরে।"

ছন্দটি পাঠ করার পর সে মনে মনে ভাবলো এবার একটা চমৎকার কৌশল শিক্ষা করেছি। একদিন সে দেখলো তার বন্ধু অন্য এক ব্যক্তির সাথে ভীষণ ভাবে মারামারি করছে। বন্ধু তার সাধ্য মত দুই হাতে মার ঠেকাচ্ছিল। এই ব্যক্তিটি বন্ধুর বিপদ দেখে দৌড়ে এসে তার দুই হাত ধরে রাখলো। ফলে বন্ধু একটি মারও আর ঠেকাতে পারলো না। বিপক্ষ লোকটি ইচ্ছামত মার দিয়ে যখন চলে গেল তখন সে হাত ছাড়লো।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, "কি বন্ধু, তুমি আমার বিপদের সময় হাত ধরে

রাখলে যে?"

সে জওয়াব দিল, "কেন তুমি কি শেখ সা'দীর এই কবিতাটি পড়নি?"

"সেই হলো বন্ধু যে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর হাত ধরে।"

ভাগ্য ভাল যে ফারসী 'দাসত্' শব্দের অর্থ 'হাত' ধরেছে, দাস্ত (পায়খানা) ধরে নিয়ে আসেনি।

সুতরাং যারা কোরআন পাকের বাংলা তরজমা পড়ে নিজের বুঝা অনুযায়ী আমল করতে চায় তারা এই মুর্খটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

বুড়ির কান্ড

এদের আরেকটি উদাহরণ হলো সেই বৃদ্ধার ন্যায় যার বাড়ীতে বাদশাহর পোষা বাজ উড়ে গিয়ে পড়েছিল।

বৃদ্ধা পাখীটি ধরে আফসোস করে বলতে লাগলো, 'আহা! বাদশাহর বিলাসিতায় তোর এই দূর্দশা হয়েছে। খাঁচায় আটকিয়ে রেখেছিল এতদিন, নখগুলিও কেটে দেয়নি। কত বড় বড় নখ হয়েছে।'

এই বলে সেই পাখীর সব কয়টি নখ একেবারে গোড়া থেকে কেটে দিল।

এরপর বাজের বাঁকা ঠোঁটটি দেখে বলে উঠলো, "আহা খাঁচার মধ্যে অযত্নে থাকতে থাকতে ঠোঁটটি কেমন বাঁকা হয়ে পড়েছে। আয় তোর ঠোঁট সোজা করে দিই।"

এই বলে ঠোঁটের বাঁকা অংশ ছুরি দিয়ে চেঁছে ঠোঁটটি সম্পূর্ণ সোজা করে দিল।

ফল হলো এই যে, বাজটি আর কোন দিন পায়ের নখের সাহায্যে ছোঁ মেরে শিকার ধরতে পারবে না এবং আর কোন দিন ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে শিকারের মাংস খেতে পারবে না।

এই অবুঝ বৃদ্ধাটি বাজের উপকার করতে গিয়ে জীবনের মত তাকে পঙ্গু করে দিল।

সেইরূপ অনেকে কোরআন পাকের বাংলা তরজমা পাঠ করে এই অবুঝ বৃদ্ধার মত মূল বস্তুকে পরিবর্তন করে ভুলভাবে অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

-- আল- এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১০২-১০৩।

'আমীন' তিন প্রকার

কোন কোন গায়র মুকাল্লেদ (তথাকথিত আহ্লে হাদীস) এক আশ্চর্য বস্তু বটে। এবাদতের মধ্যেও তারা হিংসা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

নামাজের মধ্যে সশব্দে 'আমীন' বলা নিঃসন্দেহে একটি সুন্নত আমল। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য থাকে যারা আমীন নিঃশব্দে বলে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ছুড়ে মারা। আসলে শরীয়ত এই হিংসামূলক ফাসাদকেই শুধু নিষেধ করে থাকে।

এক এলাকায় এই মতভেদের তদন্তে এক ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত হলো।

বিচারক তদন্ত শেষে এক অবাক করে দেওয়া নিরপেক্ষ ফয়সালা লিপিবদ্ধ করলেন। লিখলেন- 'আমীন' তিন প্রকার। একটি হলো সশব্দে আমীন। এটা শাফেয়ীর মাজহাব। এর সমর্থনে অনেক হাদীস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হলো নিঃশব্দে আমীন। এটা হানাফী মাজহাব। এর সমর্থনেও অনেক হাদীস আছে।

তৃতীয় প্রকার হলো যারা নিঃশব্দে আমীন বলে তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাবে এত উচ্চস্বরে আমীন বলা হয় যেন শ্লোগান ছুড়ে মারছে। এটা কোন ইমামের মাজহাব নয় এবং এর সমর্থনে কোন হাদীসও নাই। সুতরাং এটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

-- আল- এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩২।

জমিদার বাবুর আল্লাহ্ দেখার ঘটনা

এক জমিদার ছিল তার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। একদিন সে ভাবলো, জীবনে অনেক কিছুই পেলাম, অনেক কিছুই দেখলাম। কিন্তু একটা জিনিষ দেখতে পেলাম না। এই জিনিষটা দেখতে পেলেই আমার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়। যিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, আমাকে ধন-সম্পদ, বিবি-বাচ্চা আর ভোগের সকল সামগ্রী প্রদান করলেন সেই ভগবানকেই দেখা হলো না। সুতরাং যেভাবেই হোক ভগবানকে দেখতে হবে।

তিনি বাড়ী থেকে বাহির হলেন। এক ব্রাক্ষ্মণ পুরোহিতের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি ভগবানকে দেখতে চাই। আপনি কি আমাকে ভগবান দেখাতে পারেন ?"

ব্রাক্ষ্মণ বললো, "অবশ্যই! ভিতরে আসুন।" এই বলে সে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি মূর্তি দাঁড় করানো ছিল তার দিকে ইশারা করে বললো, "এই যে ইনি হলেন ভগবান।"

জমিদার বাবু বললেন, "এই ভগবান নয়। আসল ভগবান দেখতে চাই।"

ব্রাক্ষ্মণ বললো, "আমার কাছে এই ভগবানই আছে। এছাড়া আমি আর কিছু দেখাতে পারবো না।"

জমিদার বাবু সেখান থেকে বিদায় হলেন। এরপর শুনতে পেলেন যে অমুক জায়গায় এক সাধু আছে, বহুদিন থেকে সে সাধনা করে যাচ্ছে। সে অবশ্যই ভগবান দেখাতে পারবে। সুতরাং সেদিকে রওয়ানা হলেন। তার আশ্রমে গিয়ে বললেন, "বহুদিন থেকে আমার ভগবান দেখার ইচ্ছা হয়েছে। আপনি যদি আমাকে ভগবান দেখান তবে বহুদিনের একটি সাধ পূরণ হয়।"

সাধু বললেন "ঠিক আছে। এখনই ভগবান দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে দেখছেন পর্দা! ঐ পর্দা সরালেই ভগবান দেখতে পাবেন।"

জমিদার পর্দা সরাতেই দেখেন বিশাল এক পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাধুকে বললেন, "এইসব ভগবান তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমি আসল ভগবান দেখতে চাই।"

সাধু বললেন, "এই ভগবান ছাড়া আমার কাছে আর কোন ভগবান নাই। আপনি অন্যখানে চেষ্টা করুন।"

অতঃপর জমিদার বাবু আরেক সাধুর সন্ধান পেলেন। অনেক দূর সফর করে সেই সাধুর কাছে গিয়ে তার মনের বাসনা প্রকাশ করলেন।

সাধু বললেন, "এখন এখানেই অপেক্ষা করুন। গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হবে তখন ভগবান আগমন করবেন।"

তিনি তার কথামত অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রি যখন গভীর হলো তখন তাকে নিয়ে সাধু মন্দির থেকে বাহির হলেন। দূরে দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ঐ যে দেখেন, একটা আলো এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে ঐটাই পরমেশ্বরের জ্যোতি। জীবন্ত ভগবান, তিনি চলা-ফেরা করেন।"

জমিদার বাবু অবাক হলেন। কিন্তু তবু তার দ্বন্দ্ব রয়ে গেল। তিনি বললেন, "তাহলে কাছে গিয়ে দেখে আসি?"

সাধু বললেন, "খবরদার ! কাছে যেয়ো না জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবা।"

কিন্তু জমিদার বাবু আগ্রহের আতিশয্যে ছুটে গেলেন পরমেশ্বরের জ্যোতি দেখতে। কাছে গিয়ে দেখেন একটি কচ্ছপের পীঠের উপর সিমেন্টের ঢালাই করা সমতল একটা পাটাতন। তার উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। কচ্ছপটি এদিক-সেদিক চলাফেরা করার সময় প্রদীপের আলোও এদিক থেকে ওদিকে চলাফেরা করছে। একেই পরমেশ্বরের জ্যোতি নাম দিয়ে সাধু অনেক লোককে দেখিয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

জমিদার বাবু সাধুর কাছে ফিরে এসে বললেন, "এটাতো একটা কচ্ছপ মাত্র, ভগবান কোথায়?"

সাধু বললেন, "আমার কাছে এইটাই আছে। আর কোন ভগবান নাই। তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ, কারো কাছে একথা প্রকাশ করিও না। তুমি কোথাও যেয়োনা। আমার কাছেই থেকে যাও। হালুয়া রুটি এখানে প্রচুর আসে খেতে পারবা।"

জমিদার বললেন, "হালুয়া রুটি আমার বাড়ীতে অনেক আছে। হালুয়া চাই না। ভগবান চাই।"

অবশেষে তিনি মুসলমানদের স্মরণাপন্ন হলেন। এক মসজিদে গিয়ে একজন মুসল্লীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে?"

লোকটি আমার নাম বলে দিল যে তিনি হলেন মওলানা আশরাফ আলী থানুবী।

অতঃপর জমিদার বাবু বহু রাস্তা অতিক্রম করে একদিন আমার কাছে এসে বললো, "আমি আল্লাহ্‌কে দেখতে চাই। বহু লোকের কাছে গেছি কেউ আমাকে দেখাতে পারেনি। সাধু-সন্যাসী-পুরোহিতের কাছে গেলাম সবাই প্রতারণা করেছে। আমি আশা করি আপনি আমাকে আল্লাহ্ দেখাতে পারবেন। আর আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি, আপনি যদি আল্লাহ্ দেখাতে পারেন তবে আমি মুসলমান হয়ে যাবো।"

আমি বললাম, "তোমার মুসলমান হওয়াতে আমার কোন দরকার নাই। যদি তুমি মুসলমান হও তবে তুমি দোযখের আযাব থেকে বেঁচে যাবা এবং জান্নাতের অধিকারী হতে পারবা তাতে তোমারই লাভ। আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একটি সত্য কথা বলে দিচ্ছি, এ দুনিয়াতে কোনদিন আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবা না। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে দেখা সম্ভব নয়।

"আরেকটি সত্য কথা শুনে রাখ, তুমি যদি মুসলমান হও তবে অবশ্যই জান্নাতে যাবা। আরও সত্য হলো এই যে একজন মুসলমান মৃত্যুর পরে যখন জান্নাতে যাবে তখন অবশ্যই সে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে।

লোকটির অন্তরে সত্য কথা এত আছর করলো যে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "হুযূর, আমি মুসলমান হতে চাই, আমাকে মুসলমান করে নিন।"

আমি তার আন্তরিকতা দেখে হাত বাড়ালাম।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে সে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল।

সত্য কথার ওজন এত বেশী যে নিমেষে পাথরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে মিশে যায়।

--আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্।

মন্ত্রীর বুদ্ধি

পাশ্চাত্য প্রভাবিত অনেক বুদ্ধিজীবি আজকাল মোল্লাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন। আগেকালের যুগেও তাই করা হতো। এক বাদশাহর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। বাদশাহ বলতেন, "আলেমদের জ্ঞানের গভীরতার কোন তুলনা হয় না"। কিন্তু তার মন্ত্রী এ ব্যাপারে মতভেদ করতেন।

একদিন বাদশাহ্ পুকুরের পাড়ে সান্ধ্য ভ্রমণ করছিলেন। তখন অযত্নে প্রতিপালিত মলিন বেশে বগলে কেতাব নিয়ে মাদ্রাসার এক ছাত্র সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। বাদশাহ্ তাকে কাছে ডাকলেন এবং মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, "মন্ত্রী বলুন তো এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?"

মন্ত্রী বললেন, "প্রথমে এই পুকুরের পাশে অন্য একটি নতুন পুকুর খুঁড়তে হবে। তারপর গ্লাস ভরে ভরে এই পানি সেই পুকুরে রাখতে হবে। পানি নিঃশেষ হলে বুঝা যাবে এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে।"

বাদশাহ তখন মাদ্রাসার ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মৌলবী সাহেব, আপনি কি বলতে পারেন এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?'

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দিল, "এই প্রশ্নটি আসলে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এখানে বলা হয়নি গ্লাসটি কত বড়। যদি গ্লাসটি পুকুরের সমান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এই পুকুরে এক গ্লাস পানি আছে। আর যদি গ্লাসটি

পুকুরের অর্ধেক হয় তবে দুই গ্লাস পানি আছে। এভাবে পুকুর এবং গ্লাসের আনুপাতিক মাপ অনুযায়ী হিসাব করে নিন পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে"।

বাদশাহ মন্ত্রীকে বললেন, "দেখুন এবার জ্ঞানী কাকে বলে। প্রশ্ন অনুযায়ী আপনার জওয়াবটি যথেষ্ট হতে পারেনি। অথচ সাধারণ একজন মাদ্রাসার ছাত্র একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জওয়াবে সমস্ত জটিলতা নিরসন করে দিয়েছে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী কে একবার ভেবে দেখুন।"

আজকালকার বুদ্ধিজীবীগণের ভ্রম এখানেই যে, অভিজ্ঞতা (Experience)-এর আলোকে তারা যেখানে পৌঁছতে পারেন তাকে জ্ঞানের ফল মনে করে থাকেন। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে তারা একই বস্তু মনে করেন। অথচ এই দুইটি জিনিষ পরস্পর সম্পুর্ণ পৃথক। অভিজ্ঞতা এক জিনিষ আর জ্ঞান অন্য জিনিষ। মোল্লাগণ যেহেতু অভিজ্ঞতার পালায় পড়েননি তাই তাদের অভিজ্ঞতা থাকে না। তবে তারা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন । তার প্রকৃষ্ট প্রমান হলো এই যে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে তারা সচেতন। আর জ্ঞান একথা বলে দেয় যে যারা জীবনের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন তারাই জ্ঞানী।

–আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ; খন্ড ৫, পৃষ্টা ১০০।

ইঞ্জিল নয় কদু

এক খৃষ্টান বক্তা দেওবন্দে আসতো। আমি তখন সেই মাদ্রাসায় পড়তাম। এক দিন সে এসে মাদ্রাসার কাছে বক্তৃতা শুরু করে দিল। মহল্লার লোক এবং মাদ্রাসার ছাত্র সমবেত হয়ে বেশ বড় একটা সমাবেশ সৃষ্টি করলো।

খৃষ্টান লোকটি দাঁড়িয়ে হাতে সুন্দর হরফে 'ইঞ্জিল' খচিত একটি বই

নিয়ে সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার হাতে এটা কি ?'

তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলমানেরা যদি জওয়াব দেয় 'এটা ইঞ্জিল' তাহলে তাদের এই স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এটা ইঞ্জিল। আর ইঞ্জিলকে যেহেতু মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র কেতাব হিসাবে বিশ্বাস করে সুতরাং এই বইয়ের হুকুমকেও তারা মানতে বাধ্য হবে।

কিন্তু মুসলমানদের এরূপ জওয়াবের দ্বারা বিতর্কের সৃষ্টি হবে। মুসলমানেরা বলবে, 'এটা ইঞ্জিল হলেও এর হুকুম রহিত (মনসুখ) হয়ে গেছে।' আর সে বলবে 'না, রহিত হয়নি।' সুতরাং তার প্রশ্ন 'এটা কি ?' এর জওয়াবে 'ইঞ্জিল' বললে একটা স্থায়ী বিতর্কের সৃষ্টি হবে; যা কখনও শেষ হবে না।

সুতরাং কেউ কোন জওয়াব দেয়নি।

এমন সময় মাদ্রাসা কমিটির মেম্বার হাকিম মুশতাক আহমদ এসে গেলেন। তিনি ছাত্রদেরকে বললেন, "সরে যাও, এর জওয়াব দেওয়া তোমাদের কাজ নয়। আমি জওয়াব দিচ্ছি"।

তিনি বললেন, "তোমার প্রশ্নের জওয়াব আমি দিব। প্রশ্ন-যা করতে চাও কর।"

সে খুব উৎসাহের সাথে সেই বইটি হাতে নিয়ে বললো, "বলুন, আমার হাতে এটা কি ? "

তিনি বললেন, "এটা কদু।"

সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, "তুমি বড় বেয়াদব দেখছি!"

তিনি বললেন, "আমরা যা বুঝতে পেরেছি তাই বলেছি। এতে আবার বেয়াদবীর কি হলো ? অবশ্য যদি ব্যাখ্যা চাও তবে একথার ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। পরিবর্তিত করার পর এটা আর আল্লাহর কেতাব নয় যে বেয়াদবী হবে। কদু যেরূপ আল্লাহর কেতাব নয় এটাও সেরূপ আল্লাহর

কেতাব (ইঞ্জিল) নয়। কদু আর এটার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং এটাও একটা কদু। কদুকে কদু বললে কোন বেয়াদবী হয়না।"

–আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১৮।

ঘোড়ার মালিকের বিপদ

আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যা কিছু করতে হয় করে যাও। লোকে কি বলবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না। কারণ একসঙ্গে সবাইকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। তাহলে ঘোড়ার মালিকের অবস্থা হবে।

এক ব্যক্তি তার ঘোড়ায় চড়ে সফরে বাহির হলো। সঙ্গে তার বউ এবং ছেলে হেঁটে যাচ্ছিল।

একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকেরা বললো, "দেখ, দেখ। কত বড় নিষ্ঠুর ব্যক্তি! বিবি-বাচ্চাদেরকে হাঁটিয়ে মারছে আর নিজে জোয়ান মরদ সওয়ার হয়ে যাচ্ছে।"

লোকটি ভাবলো লোকেরা ঠিকই তো বলছে। এই ভেবে সে নীচে নেমে আসলো এবং ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে হেঁটে যেতে লাগলো।

রাস্তায় ছেলেকে ঘোড়ার পীঠে দেখে গ্রামের লোকেরা বললো, "দেখ,দেখ, ছেলেটা কত বড় বেয়াদব। নিজে জওয়ান মরদ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর বৃদ্ধ বাপকে হাঁটিয়ে মারছে।"

লোকটি ভাবলো, এরা ঠিকই বলছে। সুতরাং এবার বউকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিজেরা হেঁটে যেতে লাগলো।

অতঃপর একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকেরা বলতে লাগলো, "একেই বলে বউয়ের মুরীদ। মনে হচ্ছে বউয়ের কাছে একেবারে দাস-খত

লিখে দিয়েছে।"

লোকটি ভাবলো এরাও ঠিক বলছে। এই ভেবে বিবি-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে নিজে আবার চড়ে বসলো।

অতঃপর এক গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকেরা দেখে বললো, "আরে ! ঘোড়াটাকে কেন তিলে তিলে মেরে ফেলছে ? একটা গুলি মেরে দিলেই তো হয়ে যায়। একটা ঘোড়ায় একসাথে কতজন মানুষ সওয়ার হয়েছে দেখ!"

লোকটি দেখলো সবাই ঠিক বলছে। তাড়াতাড়ি সবাই নেমে পড়লো এবং লাগাম ধরে হেঁটে চললো।

পথে লোকেরা তাদেরকে দেখে বলতে লাগলো, "দেখ, না-শোকর বান্দা একেই বলে। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কোন কদর নাই। ঘরে নিজের যান-বাহন দিয়েছে, অথচ সবাই হেঁটে হেঁটে মরছে। আরে পালাক্রমে এক একজন করে চড়লেও তো পারে। সওয়ার হওয়ার যদি ইচ্ছাই না থাকতো তবে সঙ্গে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল ? ঘরে বেঁধে রেখে আসলেই তো পারতো।"

লোকটি দেখলো ঘোড়ায় চড়ার কোন পদ্ধতিই আর বাদ রাখা হয়নি। সুতরাং এখন ঘোড়ায় না চড়ে (এবং ঘোড়াকে হাঁটিয়ে না নিয়ে) অন্য কোন পদ্ধতি আছে কিনা তাই করতে হবে।

হঠাৎ লোকটির মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে আসলো। বাঁশে ঘোড়ার চার পা বেঁধে ঘোড়াকে ঝুলিয়ে বাঁশের দুই দিক থেকে দুই বাপ-বেটা ঘাড়ে করে চলতে লাগলো। ঘোড়ার মাথা নিচের দিকে থাকলো আর পা উপরের দিকে। একটি নদী পার হওয়ার জন্যে তারা যখন পুল পার হচ্ছিল তখন এই অদ্ভূত দৃশ্য দেখে পাড়ার ছেলেরা সব হো হো করে চিৎকার দিয়ে উঠলো। এই চিৎকার শুনে ঘোড়া ভয়ে এক ঝাঁকুনি মেরে ছিটকে নদীতে পড়ে গেল। বাঁশের বাড়ি খেয়ে দুই বাপ-বেটা উপুড়

হয়ে পড়ে কারো মাথা ফাটলো কারো থুথ্‌নী ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো।

লোকটি দেখলো মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিপদ কত মারাত্মক। এত চেষ্টা করেও মানুষকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছেনা। মানুষকে খুশী করতে যেয়ে ঘোড়াও হারালাম মাথাও ফাটলো।

সুতরাং মানুষের মন্তব্যকে ঝাড়ু মেরে দাও। শরীয়ত মতে যা সঠিক হয় তাই করে যাও।

মানুষকে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌কেও সন্তুষ্ট এই দুইটা এক সঙ্গে সম্ভব নয়। বরং মানুষের উক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলেই অগ্রগতি সম্ভব।

--আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ, খন্ড ৪, পৃষ্টা ৩৪৪।

মনছূরা বিবির ওযূ

ইসলামকে আজকাল খুব সহজ একটা কিছু মনে করা হয়। নিজের ইচ্ছামত যেভাবে খুশী সেভাবে ইসলামকে মানা যায়। আর যত দোষ আলেমদেরকে দেওয়া হয় যে তারা ইসলামকে খুব জটিল করে রেখেছে। এসব লোকদের ইসলাম হলো মনছূরা বিবির ওযূর ন্যায়।

মনছুরা বিবির যৌবনের প্রারম্ভে একবার ওযু করার সুযোগ হয়েছিল। এর পর সে উশৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

একদিন এক ওয়াজ মাহফিলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এক বক্তাকে ওয়াজ করতে দেখতে পেলো। বক্তা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে কি কি কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায় তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। মনছূরা বিবিও একবার ওযূ করেছিল তার মনে পড়ে গেল। কিন্তু এত সহজেই যে ওযূ ভেঙ্গে যায় তা সে কখনও শুনেনি। সুতরাং বক্তার ওয়াজ শুনে তার গায়ে জ্বালা ধরে গেল

সে তৎক্ষণাৎ মঞ্চে উঠে গিয়ে শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে বললো,"ভাইসব এই মওলানা সাহেব যা কিছু বলছেন সব মিথ্যা। এত সহজে কিছুতেই ওযূ ভাঙ্গতে পারে না। তার প্রমাণ আমি নিজেই। আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ যিনা করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার ওযূ ভাঙ্গেনি"।

ঐসব লোকদের ইসলামও ঠিক মনছূরা বিবির ওযুর ন্যায়। তারা যত নাফরমানী করবে তাদের ইসলাম ঠিকই থাকবে, তারা তবু মুসলমান হিসাবে দাবী করবে।

--আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ

জুতা সোজা করার বরকত

সরলতা মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। এরূপ সরলতা ও বিনয়ের এক ঘটনা মনে পড়ে গেছে।

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সাহেব ভূপালে অবস্থান করতেন। একবার সেই এলাকার নওয়াবের বেগম সাহেবা দীনী প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করতে হাজির হলেন। প্রয়োজন শেষে যখন তিনি বিদায় হবেন তখন মাওলানা সাহেব বেগম সাহেবার জুতা সোজা করে তার সামনে এগিয়ে দিলেন।

বেগম সাহেবা খুব লজ্জিত হলেন এবং আরজ করলেন, "আপনি দেখছি আমাকে গুনাহ্‌গার করলেন।"

মওলানা সাহেব বললেন, "আপনাকে আমি বুযুর্গ ব্যক্তি ভেবেই এভাবে জুতাগুলি সোজা করে দিয়েছি।"

বেগম সাহেবা বললেন, "কিভাবে আমি বুযুর্গ হলাম?"

মওলানা বললেন, "আমি আপনার শহরে এতকাল যাবৎ (হিন্দু

কু-সংস্কার অনুযায়ী নাবালিকা অবস্থায়) বিধবা বিবাহের জন্যে উৎসাহ দিয়ে ওয়াজ করে যাচ্ছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি বিধবারও বিয়ে হয়নি এই হলো আমার বুযুর্গী। এখন আপনি একবার নিজের বুযুর্গী পরীক্ষা করে দেখুন। শুধুমাত্র একটি সাধারণ নির্দেশ ঘোষণা করে দিন। তারপর দেখুন একটি বিধবাও বিবাহের বাকী থাকবে না। তখন আমার বুযুর্গী আপনার বুযুর্গীর সাথে তুলনা করবেন।"

বেগম সাহেবা ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং দীনদার। পরদিন সকালে তিনি দরবারে আসন গ্রহণ করেই নির্দেশ প্রচার করলেন যে এই সময়-সীমার মধ্যে কোন সন্তানহীনা বিধবা বিবাহ না করে থাকতে পারবে না; অন্যথায় কঠোর শাস্তি হবে।

অতঃপর দেখা গেল মাত্র দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত (সন্তানহীনা) বিধবার বিবাহ হয়ে গেল।

মওলানা সাহেবের কৌশল কিভাবে কার্যকর হলো দেখুন। তাঁর সরলতা এই যে তিনি জুতা সোজা করে দিতে দ্বিধা করলেন না। ফলে বেগম সাহেবার দ্বারা এত বড় একটা দীনী খেদমত গ্রহণ করলেন যা অন্য কোনভাবে সম্ভব ছিল না।

—আল এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ২৫২।

সর্বশ্রেষ্ঠ কেরামত

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) -এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে দশ বৎসর থাকলো। দশ বৎসর পর সে বললো, "হযরত! এতকাল থেকে আপনার খেদমতে আছি কিন্তু কোন কেরামত দেখলাম না!"

মনে হয় লোকটি ছিল নির্বোধ। তা না হলে এতকাল পর্যন্ত তাঁর

খেদমতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর কামালাত কিছু চোখে পড়লো না ? তাঁর কামালাতের সামনে কেরামতের কী-ই বা মূল্য যে কেরামত দেখতে হবে?

যাহোক, হযরত জুনায়েদ (রঃ) আবেগে ভরে উঠলেন। বললেন, "হে বৎস! এই দশ বৎসরে তুমি কি সুন্নতের বিরুদ্ধে আমার কোন কাজ হতে দেখেছো?"

লোকটি আরজ করলো, "হযরত! সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ তো আজ পর্যন্ত আমি আপনার হতে দেখিনি!"

তিনি বললেন, "তবে এর চেয়ে বড় কেরামত আর কী দেখতে চাও? দশ বৎসর পর্যন্ত সুন্নত বিরোধী কোন কাজ না হওয়াটাই তো বড় কেরামত।"

এই কথা শুনে লোকটির চোখ খুলে গেল। সে আর কখনও কেরামত দেখতে চায়নি।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা-২৫০।

আল্লাহর ইচ্ছাই হোক পূর্ণ

আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আনন্দ। এই আনন্দ আল্লাহওয়ালাগণ পরিপূর্ণভাবে লাভ করে থাকেন। এইরূপ এক বুযুর্গ ছিলেন শাহ দৌলাহ্। তাঁর গ্রামের লোকেরা একদিন তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলোঃ

"হুজুর! নদী ভাঙতে ভাঙতে গ্রামের দিকে ছুটে আসছে। গ্রাম বুঝি আর রক্ষা করা যায় না! আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেন যেন তিনি নদীর প্রবাহ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন।"

বুযুর্গ বললেন, "কাল সকালে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে সবাই এসো,

এর ব্যবস্থা করবো।"

সুতরাং পরদিন সকালে সবাই এসে হাজির হলো। বুযুর্গ সবাইকে নদীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, "গ্রামের দিকে পানি যাওয়ার রাস্তা খুড়তে শুরু করে দাও।"

লোকেরা বললো, "হুজুর! এভাবে তো নদী দুই দিনের রাস্তা এক দিনেই অতিক্রম করে সম্পূর্ণ গ্রামকে গ্রাস করে ফেলবে!"

তিনি বললেন, "নদী গ্রামের দিকেই যেতে চাচ্ছে। আল্লাহ তা'লারও তাই ইচ্ছা। দৌলাহ্রও ইচ্ছা তাই। আল্লাহ যেদিকে আমিও সেদিকে। তোমরা খুঁড়তে শুরু কর।"

সে যুগের লোকেরা আল্লাহ ওয়ালাদের খুব অনুসরণ করতো। সুতরাং তারা বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ গ্রামের দিকে নদীর রাস্তা খুঁড়তে শুরু করলো। রাস্তা খুঁড়ে মাটি যেখানে ফেলা হলো আল্লাহ্র কুদরতে তা এমনভাবে স্থাপিত হলো যে অল্প সময়ের মধ্যে পানির গতি পাল্টে গেল।

নদীর প্রবাহ অন্যদিকে ঘুরে গেল। গ্রাম রক্ষা পেল।

আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এরূপ শর্তহীনভাবে মিলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। কুদরতের এই অপূর্ব লীলা গ্রামবাসী স্বচক্ষে দেখতে পেলো।

——এরশাদাতে হাকীমুল উম্মত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭।

অপব্যয়ের অভিনব সংজ্ঞা

এক ব্যক্তির ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত অভাবে পড়েছিল। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক বুযুর্গের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলো।

বুযুর্গ তার অভাবের কথা শুনে ব্যথিত হলেন এবং বললেন, "সাহায্য

করার মত আমার কাছে কিছু নাই। তবে আমার এক বিত্তবান দোস্ত আছেন তার কাছে গিয়ে আমার কথা বললে আশা করি সাহায্য করবেন"।

লোকটি সেই বিত্তবান লোকের কাছে রওয়ানা হলো। যখন তার বাড়ীর দরজায় গিয়ে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভিতর থেকে একটি লোক তার স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করছে, " তোমাকে কতদিন বলেছি বাতির সলতা মোটা করে দিওনা! এই ছোট ঘরটিতে যতটুকু আলোর দরকার তার জন্যে একটি চিকন সলতাই যথেষ্ট। মোটা সলতা দিয়ে অধিক তেল পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না।"

আগন্তুক লোকটি বাহির থেকে এই কথা শুনতে পেলো। ভাবলো-- ভালো লোকের কাছে আমাকে পাঠিয়েছে! এত কৃপণের কাছে সাহায্য চাওয়ার আগেই এখান থেকে পালানো উচিৎ। এই ভেবে সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। পরে আবার ভাবলো, সাহায্য না চেয়ে বুযুর্গের আদেশ পালনার্থে শুধুমাত্র দেখা করে বলে যাই। অতঃপর সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো।

বাড়ীওয়ালা বাহিরে আসলে সে বললো, "স্ত্রী-পূত্র নিয়ে বড় অভাবে ছিলাম। আপনার দোস্তের কাছে গিয়েছিলাম সাহায্যের জন্যে। কিন্তু তার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন"।

বাড়ীওয়ালা বললো, "বেশ! আজ রাতেই মিশর থেকে আমার দুইশত উঁট বোঝাই মাল আসবে। মালসহ সমস্ত উঁট আপনি নিয়ে যান"।

লোকটি অবাক হয়ে বাড়ীওয়ালার দিকে তাকিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ীওয়ালা বুযুর্গ বললেন, "রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই কাফেলার কাছে পৌঁছে যান। ঐ উপত্যকায় গিয়ে দাঁড়ান। ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।"

লোকটি বললো, "একটু আগে বাড়ীর ভিতরে সলতা মোটা করার অপরাধে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিরস্কার করছিল। আপনি কি সেই ব্যক্তি নন?"

বাড়ীওয়ালা বললো, "হাঁ, সে আমিই। সেখানে ছোট ঘরটিতে যতটুকু আলোর প্রয়োজন ছিল তার জন্যে একটি চিকন সলতাই যথেষ্ট ছিল। মোটা সলতা ব্যবহার করে অধিক তেল পোড়ানোর প্রয়োজন ছিল না। বিনা প্রয়োজনে খরচ করাই অপব্যয়, তা যতো কমই হোক।

"আর আপনার যেহেতু ব্যবসা ধ্বংস হয়ে অভাব গ্রস্থ হয়ে পড়েছেন তাই ব্যবসা শুরু করার জন্যে মাল বোঝাই দুইশত উঁট আপনার অত্যন্ত প্রয়োজন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে খরচ করা অপব্যয় নয়, তা যত বেশীই হোক"।

লোকটি নতুন করে অপব্যয়ের সংজ্ঞা বুঝতে পারলো এবং উপত্যকার পথে যাত্রা করলো।

এই ঘটনা একজন অ-আলেম ব্যক্তি হযরত মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গুহী (রঃ) এর কাছ থেকে শুনে এসে বলেছে। প্রথম বুযুর্গ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় (বাড়ীওয়ালা বুযুর্গ) হযরত উসমান (রাঃ) কিনা তা ঠিক করে বলতে পারেনি।

--আল এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ

একটি অদ্ভুত ফতোয়া

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মেধা ছিল অদ্ভুত। ফতোয়ার ব্যাপারে তাঁর সতর্কতা ছিল তুলনাহীন। একবার ইমাম সাহেবের মজলিসে এক ব্যক্তি এসে আরজ করলোঃ

"এক ব্যক্তি বলেছে যে, 'কোন কাফের জাহান্নামে যাবে না' এই ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি হবে?"

ইমাম সাহেব তাঁর ছাত্রদেরকে বললেন, "তোমরা এই লোকটির কথার জওয়াব দাও।"

ছাত্ররা আরজ করলো, "লোকটি কাফের। কারণ সে 'নছ'কে অস্বীকার করছে (অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের সেই সব আয়াতকে অস্বীকার করছে যার অর্থ স্বতঃ প্রকাশমান)"।

ইমাম সাহেব বললেন, "তাবীল কর।" (অর্থাৎ কোন ওজর পেশ করে লোকটিকে কুফুরী থেকে বাঁচাও।)

ছাত্ররা আরজ করলো: এখানে তাবীল করার সুযোগ নাই। তাবীল অসম্ভব।

তিনি বললেন, "তাবীল আছে। আর তাহলো এই যে, জাহান্নামে যাওয়ার সময় কেউ কাফের থাকবে না, মোমেন হয়ে পড়বে। কারণ তখন দোযখ দেখতে পাবে, অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না। আর তখন দোযখীরা সবাই শরয়ী অর্থে কাফের থাকলেও লগুবী (আভিধানিক) অর্থে মোমেন হয়ে যাবে। আর সেই মোমেন অবস্থায় দোযখে যাবে। কাফের অবস্থায় নয়। তাই লোকটিকে কাফের ফতোয়া দেয়া যায় না"।

সুতরাং ইমাম সাহেবের মেধা এবং সতর্কতা কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে। কেউ কি তার পরিসীমা খুঁজে পাবে?

——আল এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৬।

হাতুড়ে ডাক্তারের কীর্তি

পীরের উদাহরণ হলো ঠিক যেন একজন ডাক্তার। ডাক্তার যদি হাতুড়ে হয় তাহলে আবার রুগীর জান বাঁচানো বিপদ। যেমন একটা প্রবাদ আছেঃ

نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملاّ خطرہ ایمان

মূর্খ ডাক্তারে জানের বিপদ

মুর্খ মোল্লায় ঈমানের বিপদ

কোন কোন মূর্খ পীর রয়েছে সব অনুসারীকে একই পাল্লায় ওজন করে থাকে। এই কারণেই মানুষের সংশোধন এবং রূহানী উন্নতি হয় না। যেমন এক মুর্খ ডাক্তারের ঘটনা রয়েছেঃ

রুগী দেখার জন্যে তাকে ডাকা হলো। সে রুগীর বাড়ী গিয়ে দেখে রুগীর গায়ে ভীষণ জ্বর। রুগীর হাত নিয়ে নাড়ী দেখতে লাগলো। নাড়ীতে হাত রেখেই সে বলতে লাগলো, "মনে হয় তুমি অধিক পরিমাণে তেঁতুল খেয়েছো।"

রুগীটি সত্যি সত্যি তেঁতুল খেয়েছিল। তাই সে অবাক হয়ে গেল যে শুধু নাড়ীতে হাত রেখে আমি যা খেয়েছিলাম তা কি করে বলে দিল। নিশ্চয় সে একজন খাঁটি ডাক্তার। সুতরাং তাকে যথারীতি ফি দিয়ে বিদায় করলো।

ডাক্তারের সঙ্গে তার ছেলেটিও থাকতো। সে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, রুগীটি তেঁতুল খেয়েছিল?"

বাপ বললো, "রুগীর চৌকীর নীচে তেঁতুলের খোসা দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম যে সে তেঁতুল খেয়েছে।"

এরপর ছেলে ভাবলো ডাক্তারী করা তো বেশ সহজ কাজ! তাই সেও ডাক্তারী করতে লেগে গেল। একদিন এক হাঁপানি রুগীর বাড়ীতে গিয়ে দেখে তার চৌকীর নীচে ছিঁড়া জুতা পড়ে আছে। তখন বাপের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী সে রুগীর নাড়ীতে হাত রেখে বলতে লাগলো, "মনে হয় আপনি ছিঁড়া জুতা খেয়েছেন তাই আপনার রোগ বেড়ে গেছে"।

এই কথা শুনে সবাই তো অবাক। 'দূর হো', 'দূর হো' বলে সবাই তাকে তাড়িয়ে দিল।

আজকাল পীরদের অবস্থাও এরকম হয়ে পড়েছে। সবাইকে একই অজিফা, একই ব্যবস্থা দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। তাছাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞতাই এসবের কারণ। এরাই তাছাওউফকে ভুল বুঝিয়ে লোকদের কাছে তাছাওউফের বদনাম করে দিয়েছে।

তাছাওউফের যে-হাকীকত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবা কেরামের জামানায় ছিল তা আজকাল লোকেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছে।

--আলএফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্।

সব টাকা নদীতে

পীরকে আসলে এমন এক ডাক্তার হওয়া উচিৎ যেরূপ এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি মুরীদ হতে গেল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে কোন টাকা-পয়সা আছে কি?"

কারণ সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকলে তাছাওউফ গ্রহণ করা অসম্ভব। লোকটি আরজ করলো, "একশত টাকা আছে।"

বুযুর্গ বললেন, " এগুলি থেকে মুক্ত হয়ে তবে এস।"

লোকটি আরজ করলো, "আচ্ছা ঠিক আছে" ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কিভাবে ঐগুলি বর্জন করবা?"

আরজ করলো, "কোন মিস্‌কীনকে দিয়ে দিব।"

তিনি বললেন, "এর দ্বারা তো মনের গোপনে অহংকারের এক স্বাদ পাওয়া যাবে যে হাঁ আমি বড় দানশীল হয়ে গেছি। বরং তুমি ঐগুলি নদীতে ফেলে এস।"

লোকটি আরজ করলো, " আচ্ছা, তাই করবো।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে নদীতে ফেলবা?"

বললো, "সব টাকা নিয়ে গিয়ে এক সাথে ফেলে দিয়ে আসবো।"

তিনি বললেন, "এভাবে নয়। বরং প্রতিদিন এক টাকা করে ফেলে আসবা।"

যেন মনের উপর করাতের আঁচড় লাগে প্রতিদিন। প্রতিদিন অনুশীলন ও ত্যাগের ঘা খেয়ে খেয়ে দুনিয়া বিদূরিত হবে। মনটা হবে স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ।

একেই বলে পীর। এরা রূহানী রোগের চিকিৎসা একজন দক্ষ ডাক্তারের মত করে থাকেন। এরা রূহানী রোগের উপসর্গ দেখে কাউকে সম্পদ সঞ্চয় করতে বলেন আবার কাউকে সম্পদ বর্জন করতে বলেন। কাউকে রাজত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করিয়ে দিয়েছেন।

অথচ এই রাজত্ব লাভকেই আজকাল চরম পর্যায়ের উন্নতি বলে মনে করা হয়। তারা বুঝে না যে আম্বিয়া (আঃ) কে প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, দুনিয়াকে মানুষের অন্তর থেকে বাহির করবেন। যদিও হাতে প্রয়োজন অনুপাতে কিছু থাকবে। অন্তরে শুধু থাকবে আল্লাহ। তাই বলছি, অন্তরকে ছাফ রাখ। বলা যায় না কখন সেখানে নূরে হক স্থান লাভ করবে। বলা যায় না কখন সেখানে নূরে রহমত প্রবাহিত হয়।

––আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ট-৭৫।

রুটি চোরের স্বীকারোক্তি

এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) এর খেদমতে সফরে রওয়ানা হলো। ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে তিনটি রুটি ছিল। এক নদীর তীরে পৌঁছে তিনি দুইটি রুটি আহার করলেন এবং পানি পান করার জন্যে নদীতে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন অবশিষ্ট একটি রুটি নাই। তিনি সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রুটি কে নিয়েছে?"

লোকটি বললো, "আমি জানিনা।"

তিনি লোকটিকে নিয়ে আবার রওয়ানা হলেন। রাস্তা চলতে চলতে যখন ক্ষুধার উদ্রেক হলো তখন তিনি দূরে একটি হরিণী দেখতে পেলেন। তার সঙ্গে দুইটি বাচ্চা ছিল। তিনি একটি বাচ্চাকে ডাকলেন। বাচ্চাটি কাছে আসলো। তিনি তাকে জবাই করলেন এবং ভূনা করে সেই লোকটিকে নিয়ে আহার করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হয়ে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে হরিণের বাচ্চা জিন্দা হয়ে চলে গেল।

ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন, "এই হরিণের বাচ্চা জিন্দা হয়ে যাওয়ার মোজেযা যিনি দেখালেন তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তুমি বল রুটিটি কে নিয়েছে?"

লোকটি বললো, "আমি জানি না।"

তিনি লোকটিকে নিয়ে আবার রওয়ানা হলেন। পাহাড় থেকে ঝর্ণা হয়ে নেমে আসা একটি নদী সামনে পড়লো। তিনি লোকটির হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, "যিনি বিনা নৌকায় নদী পার হওয়ার এই মোজেযা দেখালেন তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তুমি বল রুটি কে নিয়েছে?"

লোকটি আগের মতই জওয়াব দিল, "আমি জানি না"।

হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর এক জঙ্গলের কাছে পৌঁছে বালি জমা

করতে শুরু করলেন। যখন এক বিরাট বালির স্তুপ হয়ে গেল তখন সেই স্তুপকে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহর হুকুমে সোনা হয়ে যাও।"

তখনই বালির স্তুপটি সোনা হয়ে গেল।

তিনি সেই সোনাকে তিন ভাগ করলেন এবং লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই তিন ভাগ সোনার মধ্যে এক অংশ আমার, আর এক অংশ তো াার এবং অপর অংশটি যে রুটি নিয়েছে তার।"

এই কথা শুনে লোকটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, "রুটি তো আমিই নিয়েছিলাম।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তাহলে তুমি সব সোনাই নিয়ে নাও"। এই বলে লোকটা থেকে পৃথক হয়ে তিনি চলে গেলেন।

লোকটি তিন ভাগ সোনার সবগুলি একা পেয়ে মনের আনন্দে জঙ্গলের ধারেই অবস্থান করতে লাগলো। এমন সময় দুই ব্যক্তি এসে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো।

লোকটি বললো, "লড়াই করার মধ্যে হেরে যাওয়ার ভয় সবারই আছে। তাই লড়াই না করে এসো আমরা এই সম্পদ সমান তিন ভাগ করে নিই। তোমরা একজন বাজারে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এসো। ক্ষুধা নিবৃত্তি করার পর মাল ভাগ করা যাবে।"

সুতরাং তার প্রস্তাবে তারা রাজি হলো এবং সেই দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি খাবার আনতে বাজারে গেল এবং মনে মনে ভাবলো, খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিলে এই দুইজন মারা যাবে তখন সমস্ত সোনা আমার একার হয়ে যাবে। এই ভেবে সে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিল।

এদিকে এরা দুইজন পরামর্শ করলো যে এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে যদি মেরে ফেলা হয় তবে সমস্ত সোনা তাদের দুই জনের ভাগে বেশি করে পড়বে। তাই লোকটি বাজার থেকে ফিরে আসতেই তাকে মেরে ফেলতে হবে।

সুতরাং লোকটি যখন খাবার নিয়ে ফিরে আসলো তখন দুইজন মিলে তাকে হত্যা করে ফেললো এবং মনের আনন্দে খাবার খেতে লাগলো। খাবার খাওয়া শেষ হতে না হতেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় দুইজন সেখানে মারা পড়লো।

সোনার তিনটি স্তুপই যেমনকার তেমনি সেখানে পড়ে রইল। কেউ পেল না। তিন জনের লাশই সোনার পাশে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে পড়ে থাকলো।

ঘটনাক্রমে ঈসা (আঃ) আবার সেই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে সবাইকে ডেকে বললেন, "দেখ, সম্পদের হাকীকত এই। এর লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাও"।

--কাছাছুল আউলিয়া, খণ্ড ৭. পৃষ্ঠা-১০০১।

কে বড় সৈয়দ না আলেম

আদব প্রদর্শনের ব্যাপারে আল্লাহওয়ালাগণ হলেন এক সুন্দর আদর্শ। সবকিছুকেই যথা নিয়মে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আমাদের হাজী সাহেব (রঃ) আলেম, সৈয়দ এবং বৃদ্ধদের খেদমত গ্রহণ করতেন না। তাদের এই গুণের প্রতি বিশেষভাবে আদব প্রদর্শন করতেন।

হযরত মওলানা শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, " হযরত! আলেম উত্তম না সৈয়দ উত্তম ?"

তিনি বললেন, "এ কথা আমরা বলতে পারি যে তুমি একজন অশিক্ষিত সৈয়দ আমাদের কাছে এনে দাও, আমরা তাকে দশ বৎসরে আলেম বানিয়ে দিব। আর আমরা তোমাকে একজন অ-সৈয়দ দিব, তুমি তাকে বিশ বৎসরে সৈয়দ বানিয়ে দিও দেখি!"

কত অদ্ভুত জওয়াব! তুলনা করে বুঝিয়ে দিলেন, অথচ সৈয়দ বংশেরও

বেয়াদবী হলো না আবার আলেমেরও বেয়াদবী হলো না।

--আলএফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ্, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-২৭৫।

নওয়াব সাহেবের বাড়ী নির্মাণ

আজকাল দুনিয়া থেকে আদব-কায়দা প্রায় বিদায় নিয়েছে; তাই মানুষের মধ্যে এত পেরেশানী, বে-বরকতী এবং হতাশা। সুতরাং পরস্পর আদব ও সম্মান অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

আল্লাহ্ পাকের নামেরও আদব করা উচিৎ। যেমন 'আল্লাহ' নামের আদব করেছিলেন টোঁকের নওয়াব।

টোঁকের নওয়াব তাঁর আরামের জন্যে একটি বাড়ী নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। নির্মাণকারী নওয়াব সাহেবের দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে খুশী করার জন্যে বাড়ীর শীর্ষে 'আল্লাহ' শব্দটি লিখে দিল। যখন বাড়ী বানানো সম্পন্ন হলো তখন নওয়াব সাহেব বাড়ীটি দেখতে আসলেন।

তিনি দেখলেন আল্লাহর পবিত্র নামটি বাড়ীর শীর্ষদেশে অবস্থান করছে। তিনি বললেন, "এই বাড়ীতে বসবাস করা যাবে না। এতে বসবাস করা বেয়াদবী হবে। এই বাড়ী এখন আদব করার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সেই থাকতে পারে যে সব সময় 'আল্লাহ-আল্লাহ' করতে পারবে। এটা এখন থেকে এবাদতের ঘর হবে। বসবাসের জন্যে অন্য আরেকটি বাড়ী নির্মাণ করা হউক।"

অতঃপর নওয়াব সাহেব এই বাড়ীতে এসে শুধুমাত্র নামাজ পড়তেন এবং এবাদত বন্দেগী করতেন।

একেই বলে আদব। আদব যার অন্তরে একবার স্থান করে নিয়েছে সে আল্লাহ নামের যেমন আদব করে থাকে তেমনি তাঁর মখলুকের আদব

করতেও ভুলে না। দুনিয়ার সুখ ও শান্তি তারাই ভোগ করে থাকে। পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে অনাবিল সুখ।

--আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৯।

ছোরা মারার ফল

তরীকত পন্থীদের অবস্থা ঠিক বরযখবাসীদের মত হয়ে থাকে। এক এক জনের উপর এক এক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু সবাই আল্লাহর আশেক হয়ে থাকেন।

হযরত বায়েজীদ (রঃ) এর অবস্থা এভাবে লিখিত আছে যে তিনি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে গিয়ে এত প্রভাবিত হয়ে পড়তেন যে তিনি বলে উঠতেনঃ

سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمَ شَأْنِىْ

"পবিত্রতা আমার, কত মহান আমার মর্যাদা!"

মুরীদগণ একবার আরজ করলেন, "হযরত, আপনি এরূপ আপত্তিকর কথা বলে থাকেন।"

তিনি বললেন, "এরূপ বলা খুব খারাপ, (যেহেতু মুরতাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড) তাই আবার যদি এরূপ কথা বলি তবে ছোরা মেরে আমাকে প্রাণে শেষ করে দিও"।

এরপর আল্লাহর আশেক আবার সেই অবস্থার শিকার হলেন এবং বলে উঠলেন।

سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمَ شَأْنِىْ

"পবিত্রতা আমার, কত মহান আমার মর্যাদা!"

মুরীদগণ পূর্বনির্দেশ মত চারিদিক থেকে ছোরা মারতে লাগলেন। কিন্তু

একি? ছোরার আঘাত সব ফিরে এসে নিজেদের গায়েই লাগতে লাগলো। বুযুর্গের গায়ে একটি আঘাতও লাগলো না। নিজেরাই সব আহত হয়ে পড়লো।

বুযুর্গ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন তখন মুরীদগণকে আহত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি অবস্থা তোমাদের? আমাকে প্রাণে মেরে শেষ করে দিলে না?"

মরীদগণ কাঁদতে কাঁদতে আরজ করলেন, "হযরত! একি কৌশল বলে দিয়েছেন আমাদেরকে? আমরা যতটি আঘাত করেছি ততটি আঘাত ফিরে এসে আমাদের গায়েই লেগেছে। আপনার কিছুই হয়নি।"

তিনি বললেন, "তাহলে বুঝা গেল সেই কথাটি আমি বলিনা। যদি বলতাম তবে নিশ্চয় আমার উপর শাস্তি কার্যকর হতো। বলার যার অধিকার তিনিই বলে থাকেন।"

যেমন হযরত মুসা (আঃ) যখন তুর পাহাড়ে হাজির হলেন তখন তূর পাহাড়ের বৃক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো;

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ"।

সুতরাং আল্লাহ পাকের কথা প্রকাশের যোগ্যস্থল যদি বৃক্ষ হতে পারে তবে মানুষ যদি তাঁর কথা প্রকাশের স্থল হয় তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই।

--আল-এফাযাতুল; য়্যাউমিয়্যাহ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৩১৬।

আরেক বেদআত

আল্লাহ পাকের সত্ত্বা নিয়ে কথা বলা বিপদজনক। কারণ তাঁর গুণাবলীর গভীরে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আকায়েদবিদগণ এ ব্যাপারে যেসব কথা বলেছেন তা নিতান্ত প্রয়োজনে বলেছেন। আর সেই প্রয়োজনটি হলো প্রথমে যখন কিছু লোক আকায়েদের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের পূর্বসুরী সলফগণের মতবিরুদ্ধ কিছু নিয়ম কানুন উদ্ভাবন করে তাকে ইসলামী বিধান হিসাবে চালাতে সচেষ্ট হয় তখনই তা প্রতিরোধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর শুধুমাত্র তখনই আকায়েদবিদগণকে মুখ খুলতে হয়।

এক ব্যক্তির ঘটনা শুনেছি। লোকটি অনেক দূরের সফর অতিক্রম করে প্রখ্যাত আকায়েদবিদ আবুল হাসান আশআরীর সঙ্গে দেখা করতে আসলো। লোকটি তাঁকে আগে কখনো দেখেনি। সেই জন্যে সে তাঁকে চিনতো না। ঘটনাক্রমে প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো এবং তাঁকে বললো, "আমি আবুল হাসান আশআরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

তিনি তখন তৎকালীন বাদশাহ্‌র আহ্বানে একটি বাহাছ (বিতর্ক) অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন।

তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে আসেন, তাঁর দেখা পাবেন।"

লোকটি তাঁর সাথে সাথে গেল।

অনুষ্ঠানে সকল মতবাদের আলেম উপস্থিত ছিলেন। একটি বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দিতে সবাই নিজ নিজ বক্তব্য রাখলেন। আবুল হাসান চুপ হয়ে বসে রইলেন। সবার শেষে যখন তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন তখন সকল মতবাদকে এমন ভাবে প্রতিরোধ করলেন যে সবাই নীরব হয়ে গেল। কারো মুখে রা বাহির হলো না। সকল ভ্রান্ত মতবাদ মূহুর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যখন অনুষ্ঠান শেষ হলো তখন মুসাফির লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, "আবুল হাসান আশ্‌আরীর সাথে আমাকে কখন দেখা করাবেন?"

তিনি বললেন, "আমিই আবুল হাসান আশ্‌আরী।"

লোকটি একথা শুনে খুব আনন্দিত হলো; এই ভেবে যে আবুল হাসান সম্পর্কে যতটুকু শুনেছিলাম তার চেয়ে বেশি তাঁকে পেয়েছি। তখন সে আরজ করলো, "আপনি যদি প্রথমেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেন তবে অন্যদের ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে কথা বলার হিম্মত হতো না। কিন্তু আপনি প্রথমেই আপনার কথাগুলি কেন বলে দিলেন না? ব্যাপারটি বুঝতে পারছি না।"

তিনি বললেন, "যে-বিষয়টির উপর আমাদের পূর্বসূরী সলফগণ কথা বলেননি সে বিষয়ে কথা বলা বেদআত। এই জন্যে আমি প্রথমে কথা বলিনি। অতঃপর যখন তাদের ভ্রান্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন তার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং (এইরূপ) প্রয়োজনে কথা বলা বেদআত নয়।"

সুবহানাল্লাহ্! কত উঁচু মকামের কথা বললেন তিনি, কত সুক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি!

——আল-এফাযাতুল য়্যাঊমিয়্যাহ্; খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১৪।

খরবুজা সমাচার

মৌলবী ফয়জুল হাসান ছিলেন এক অপূর্ব মেধার অধিকারী। তিনি যখন লাহোরে অবস্থান করতেন তখন একদিন চার আনা দিয়ে একটি খরবুজা খরিদ করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। খরবুজাটি কেটে দেখলেন একদম পান্‌সা। দোকানে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। দোকানদারকে বললেন, "ভাই

এটা সম্পূর্ণ পান্‌সা, খরবুজাটি ফেরত নিন।"

দোকানদার বললো, "মওলানা! এটা আর এখন আমার কোন্ কাজে লাগবে? আপনি তো কেটে ফেলেছেন, এখন আর কে কিনবে এটা?"

তিনি বললেন, "আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে"। এই বলে তিনি দোকানের কাছেই চাদর বিছিয়ে তার উপর খরবুজাটি রেখে বসে পড়লেন। যখনই দোকানে কেউ খরবুজা খরিদ করতে আসে তিনি বলেন, "খরবুজা তো খরিদ করবেন, তার আগে নমুনা চেখে দেখুন।"

নমূনা চেখে দেখে সবাই ফিরে যায়। কেউ খরবুজা খরিদ করে না।

এবার দোকানদার সমস্যায় পড়ে গেল। সে বললো, "মওলানা! আপনার চার আনাও ফেরত নিন, আর আমাকে মাফও করুন।"

তিনি চার আনা ফেরত নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। এভাবে তিনি 'খেয়ারে আয়েবে'র হক আদায় করলেন।

তাই আমি বলি, কেউ যদি দরসী কেতাব (পাঠ্যপুস্তক) ভাল করে বুঝে পড়ে তবে সে করতে পারে না এমন কোন কাজ নাই। এমনকি রাষ্ট্রও যদি তার হাতে এসে যায় তবু সে সকলের চেয়ে ভালভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে।

—আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ্; খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩১।

মুসলমান হওয়ার পদ্ধতি

ভূপালে এক হিন্দুকে মুসলমান করার অভিযোগে এক বুযুর্গের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো। হাকীম তাঁকে গোপনে বললেন, স্বাক্ষী-প্রমাণ নাই কাজেই তিনি যেন স্বীকার না করেন যে তিনি তাকে মুসলমান করেছেন।

তিনি বললেন, "যা' বলা উচিৎ তা সময় হলেই বলবো।"

যখন আইনগত সওয়াল-জওয়াব শুরু হলো তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি তাকে মুসলমান করেছেন?"

তিনি জওয়াব দিলেন, "মুসলমান তো সে নিজেই হয়েছে। আমি শুধু পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছি। কোন কাজের পদ্ধতি প্রকাশ করা অপরাধ হতে পারে না।"

হাকীম বললেন, "পদ্ধতি প্রকাশ করাটাই আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান করা হলো।"

তিনি বললেন, "এরূপ অনর্থক কথা কোন আইন হতে পারে না।"

হাকীম হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি মন্ত্রীর স্মরণাপন্ন হয়ে কি করা যায় জানতে চাইলেন।

মন্ত্রী জওয়াবে লিখলেন, "যে ব্যক্তি আইনের আওতায় পড়ে না তাকে জোর করে কেন অপরাধী বানাতে চাও?"

সুতরাং মামলা খারিজ হয়ে গেল।

জ্ঞান সত্যিই অদ্ভুত এক নেয়ামত।

--আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়াহ; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১১।

অপহরণ মামলার ফল

কোন কোন ইংরেজও বেশ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। ভূপালের একটি ঘটনা রয়েছে। এক স্ত্রীলোককে এক ব্যক্তি মুসলমান করেছিল। ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। হাকীম এদেশীয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে অপহরণের দায়ে শাস্তির আদেশ দিলেন। অতঃপর এক ইংরেজ হাকীমের আদালতে আপীল করা হলো। তার ফয়সালায় এক অপূর্ব জ্ঞানের পরিচয় দিলেন এভাবেঃ

"এখানে বিষয় দুইটি। একটি হলো অপহরণ করা, অপরটি হলো 'পথ দেখানো'। পথ দেখানো কাকে বলে এবং অপহরণ করা কাকে বলে, যে ব্যক্তি এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না সে হাকীম হওয়ার অযোগ্য।

"যদি কোন ব্যক্তি নিজের ধর্মকে অন্যের জন্যে ভাল মনে করে এবং তার প্রতি কাউকে প্রেরণা দান করে তবে সে তার মতে ভাল পথে আহ্বান করেছে। আর ভাল পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি কখনও অপরাধী হতে পারে না"।

"যদি কোন সোনার গহনার ঘটনা হতো অথবা যৌন কামনার বিষয় হতো তবে অপহরণ হতে পারতো; কিন্তু এখানে সেটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি"।

--আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১০।

বেদআতের কয়েকটি উদাহরণ

সুন্দরী নারীর চোখ :

হযরত মওলানা মুহেব্বুদ্দিন ছিলেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মক্কী (রঃ) এর খলীফা। তিনি কাশ্‌ফওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি ভাবলেন, হাদীস শরীফে সেই দুই রাকাত নামাযের বড় ফযিলত রয়েছে যা পরিপূর্ণ অযূ সহ পড়া হয় এবং মনে মনে কোন আলাপের সৃষ্টি না হয়। হায় আফসোস! আমার সারা জীবনে এই রকম দুই রাকাত নামায নছীব হলো না! যাই দেখি চেষ্টা করি।

এই বলে তিনি দুই রাকাত নামায পড়লেন। নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্যে দুই চোখ বন্ধ করে নিলেন। ফলে কামিয়াবীর সাথে নামায

শেষ হলো। সফলতার আনন্দে তিনি ভাবলেন দেখি মেছালী জগতে এই নামায কী রূপ ধারণ করেছে! তিনি মোরাকাবা করলেন।

দেখেন পরমা সুন্দরী এক বেহেশতী নারী মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিপাটি সাজানো। চোখ দুইটিও অপূর্ব সুন্দর। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন। কিন্তু হায়! নারীর চোখে দৃষ্টি নাই। পরমা সুন্দরী এই নারীর চোখ কেন অন্ধ ? ভাবনায় অধীর হয়ে তিনি হাজী সাহেবের স্মরণাপন্ন হলেন।

হাজী সাহেব (রঃ) বললেন, "মনে হয় আপনি চোখ বন্ধ রেখে নামায পড়েছেন। চোখ খোলা রেখে নামায পড়া সুন্নত। নামাযে অবাঞ্ছিত চিন্তার উদ্রেক হওয়ার জন্যে পাকড়াও করা হয় না। পাকড়াও করা হয় সুন্নতের খেলাফ করার দরুণ"।

সুন্নতের স্থলে অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সওয়াবের কাজ মনে করাই বেদআত।

সুন্নতের কোন বিকল্প হয় না। যদি হয় তবে সেটা বেদআত।

প্রিয়ার হাতে ছয় আঙ্গুলঃ

আরও শুনুন। সফরের সময় চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়া উত্তম। শুনতে কেমন যেন আশ্চর্য শোনা যায় যে অধিক পড়ার চেয়ে কম পড়াটাই উত্তম। কিন্তু হযূর পাক (দঃ) এই রকমই নির্দেশ করেছেন। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। দেখুন, যদি কারো প্রিয়ার হাতে ছয়টি আঙ্গুল থাকে তবে সে ছয়টি আঙ্গুল পছন্দ করে না বরং পাঁচটিই পছন্দ করবে।

অতএব আল্লাহ পাক শুধু দেখবেন আমার প্রিয় নবী (দঃ) এর মত কে হতে পেরেছে। নবীকে ছাড়িয়ে অতিরিক্ত কিছু করলেই সেটা হবে দৃষ্টিকটু এবং বেদআত।

রুগী ও ডাক্তার :

আরেকটি উদাহরণ নিন। ডাক্তার যদি রুগীর জন্যে পাঁচ রতি লিখে দেন, আর আপনি যদি দশ রতি খাইয়ে দেন তবে সেই পাঁচ রতিও বেকার

হয়ে যাবে। অথচ দশ রতি থেকে পাঁচ রতিই অল্প। কিন্তু পাঁচ রতি নির্দেশ অনুপাতে রয়েছে তাই তাতে উপকার। আর দশ রতি নির্দেশের অতিরিক্ত হওয়ার কারণে বেকার।

অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহেজগারী শুধু ততটুকু গ্রহণ কর যতটুকু হুযুর পাক (দঃ) নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে বেশী কিছু করতে যেয়ো না। কারণ এই অতিরিক্ত কাজটিই বেদআত।

শীতকালে পাখার বাতাসঃ

বেদআত একটি ধ্বংসাত্মক কাজ। ধরুন পাখার বাতাস দেওয়া একটি উত্তম খেদমত। কিন্তু শীতের দিন। প্রচন্ড শীত। তখন কেউ যদি আপনার খেদমতের জন্যে পাখার দোলা দিতে থাকে তবে কি তা' আপনার সহ্য হবে ? অথচ সে খেদমতের (সোয়াবের) নিয়তেই বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার কারণে আপনার কাছে তা' গ্রহণীয় না হয়ে বিরক্তিকর হয়ে পড়েছে।

বেদআতের উদাহরণ ঠিক সেই রূপ।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৮৭।

তুলা গুড় এবং কুকুরের গোশ্ত

এক ব্যক্তির এক ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল বোকা। সেজন্যে পিতার ভাবনার অন্ত ছিল না।

মৃত্যুর সময় পিতা ছেলেকে ডেকে বললো, "আমার মৃত্যুর পর যারা শোক প্রকাশের জন্যে আসবে তাদের সঙ্গে নরম এবং মিষ্টি কথা বলিও। উঁচা জায়গায় বসায়ো এবং মোটা কাপড় পরে তাদের সঙ্গে দেখা করিও। আর মূল্যবান খাবার খেতে দিও"।

পিতা ভাবলেন, ছেলে যদি এই ওছিয়ত মত চলে তবে কিছুটা সামাজিকতা রক্ষা করতে শিখবে এবং ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পিতা মারা গেলেন।

মৃত্যুর পর পিতার এক বন্ধু শোক প্রকাশ করতে এসে দরজায় কলিং বেল টিপেছে। চাকর দরজা খুলে সোফায় বসতে দেয়।

ছেলেটি চাকরকে বললো, "এখানে নয়। ঘরের ছাদে পানির ট্যাংক আছে সেখানে বসতে দাও"।

সুতরাং বেচারা মেহমানকে টেনে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে উঁচুতে পানির ট্যাংকের উপর বসানো হলো।

অতঃপর ছেলেটি কার্পেট পরলো এবং গায়ে জাজিম জড়িয়ে মেহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মেহমানটি গদ গদ কণ্ঠে তার বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, "তোমার আব্বার কী অসুখ হয়েছিল?"

ছেলেটি বললো, "তুলা।"

মেহমান আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি কবে মারা গেছেন?"

ছেলেটি বললো, "গুড়।"

বেচারা মেহমান কয়েকবার প্রশ্নের জওয়াবে যখন 'তুলা আর 'গুড়' ছাড়া কোন জওয়াব পেলেন না তখন চুপ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে চাকরকে হুকুম হলো, "মেহমানকে পানির ট্যাংক থেকে নীচে নামাও"।

সুতরাং নীচে নামানো হলো এবং খাবার পরিবেশন করা হলো। মেহমান গোশত মুখে দিয়ে যখন ছিঁড়তে পারলেন না তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে ফেললেন, "গোশত সিদ্ধ হয়নি।"

ছেলেটি বললো, "বলেন কি? আমি আপনার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা

দামের কুকুর কেটেছি অথচ আপনার পছন্দ হলো না?"

লোকটি এবার ব্যকুল হয়ে উঠলো। ছেলেটির কীর্তিকলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ছেলে বললো, "আব্বা আমাকে ওছিয়ত করেছেন যে মৃত্যুর পর তাঁর যে-সকল বন্ধু-বান্ধব আসবেন তাদেরকে যেন উঁচা জায়গায় বসাই, মোটা কাপড় পরে তাদের সামনে যাই, নরম এবং মিষ্টি কথা বলি এবং দামী খাদ্য খাওয়াই। সুতরাং ছাদের উপরে যে পানির ট্যাংক আছে তার চেয়ে উঁচু জায়গা আর আমার বাড়িতে নাই। তাই আপনাকে সেখানেই বসাতে হয়েছে। আর এই যে পোশাক আমার গায়ে দেখতে পাচ্ছেন তার চেয়ে মোটা কোন পোষাক আমার নাই। তাই এই কার্পেট এবং জাজিম পরে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি। আপনার সঙ্গে নরম কথা বলার হুকুম ছিল। তাই দেখলাম তুলার চেয়ে নরম আর কিছু হয় না। আপনার প্রশ্নের জওয়াবে তাই 'তুলা' বলেছি। গুড়ের চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় না। তাই 'গুড়' বলে আপনার কথার জওয়াব দিয়েছি। অতঃপর আমার বাড়ীতে এলসেসিয়ান কুকুরটি ছাড়া অধিক মূল্যবান আর কোন জন্তু ছিল না। তাই সেই কুকুরটি আপনার জন্যে কেটে দিয়েছি"।

বেচারা মেহমান এই কথা শুনে আর কাল বিলম্ব না করে সেখান থেকে পালালেন।

ছেলেটির বাপ ওছিয়ত করেছিল-কি এই উদ্দেশ্যে যে মেহমানকে বিরক্ত করা হউক? খেদমতের নামে মেহমানকে বিরক্ত করা কখনও খেদমত হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে খেদমত সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা নিম্নরূপ ঃ

খেদমতের সংজ্ঞাঃ

মখদুমের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখাই হলো খেদমত। রুচিগত কারণে না খাইয়ে যদি মেহমানের আরাম হয় তবে না খাওয়ানোটাই খেদমত। অনুরূপভাবে কোন কাজ না করে দিয়ে যদি মখদূমের অধিক আরাম হয়

তবে সেক্ষেত্রে কাজটি না করাই খেদমত। ডায়াবেটিস রুগীর হাত থেকে চিনির পেয়ালা কেড়ে নেওয়া একটি উত্তম খেদমত। আর ব্লাড প্রেসারের রুগীকে তার নিষেধ সত্ত্বেও অধিক খাদ্য খেতে বাধ্য করা একটি বড় বেয়াদবী।

জুতা কেড়ে নেওয়ার ঘটনা :

এক বুযুর্গ মসজিদ থেকে জুতা হাতে বাহিরে যাচ্ছেন। এক ভক্ত এসে হাত থেকে জুতা নিয়ে এগিয়ে দিতে গেল। কিন্তু তিনি জুতা না দেওয়ায় লোকটি বুযুর্গের সামনে এসে রাস্তা আটকালো এবং জুতা ধরে টানাটানি করতে লাগলো। শেষে বুযুর্গের ঘাড়ের কাছে এক হাতে চাপ দিয়ে আর এক হাতে হেঁচকা টান মেরে জুতা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে আঙিনার বাহিরে রেখে দিল এবং বিজয়ের হাসি হাসতে লাগলো। বুযুর্গ বেচারা ঘাড়ে এবং হাতে ব্যথা পেলেন, আর রোদে উত্তপ্ত আঙিনায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু লোকটি তবুও জুতা এগিয়ে দেওয়াকেই খেদমত মনে করেছে।

বৃটেনের রানীর মেহমানদারী ঃ

বৃটেনের রানী একবার ইরানের শাহকে দাওয়াত করেছিলেন। আহারের পর সুগন্ধ গোলানো সাবান একটি সুন্দর পেয়ালায় করে সবার সামনে রাখা হলো হাত ধোয়ার জন্যে। ইরানের শাহ্ পেয়ালাটি উঠালেন এবং খাদ্য-বস্তু ভেবে পেয়ালা পান করে নিলেন। অনুষ্ঠানের সকল মেহ্মান শাহর প্রতি অপূর্ব সম্মান দেখালেন। নিজ নিজ সামনে রাখা সাবান গোলানো পেয়ালা পান করে নিলেন।

একেই বলে ভদ্রতা। একেই বলে মেহমানদারী। মেহমান যেন একটুও লজ্জা না পান সেদিকে কতটা সতর্ক দৃষ্টি। সুবহানাল্লাহ!

—আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ; খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮২।

রাত্রি শেষের ঘটনা

এক ব্যক্তির বউ রাগ করেছিল। স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। স্বামী অনেক চেষ্টা করেও বউকে কথা বলাতে পারলো না।

অবশেষে এক রাত্রিতে বিরক্ত হয়ে বউকে বললো, "আজ ফজরের আযান হওয়ার আগে যদি কথা না বল তবে তোমার উপরে তিন তালাক"।

কিন্তু তবু বউ কথা বললো না। কারণ বউটি খুব সুন্দরী ছিল। এই স্বামীর ভাত না খাওয়াই তার ইচ্ছা ছিল। তালাক হয়ে যাওয়াটাই সে কামনা করছিল। সুতরাং কথা না বলে কোন প্রকারে ফজরের আযান পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলেই স্বামীর এই কথা তালাক হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। এই স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ হলো। সুতরাং সে মুখ আরও শক্তভাবে বন্ধ করলো।

এদিকে স্বামী আরও বিপদে পড়ে গেল। এতদিন কথা বলেনি সেই ভাল ছিল। কিন্তু এখন দেখি এই কথা দ্বারা একেবারে তালাক হয়ে যাবে। হায়, ফজর হতে তো আর বেশি দেরি নাই, এমন কথা কেন বললাম!

লোকটি খুব বিব্রত হয়ে মাসআলার খোঁজে বাহির হয়ে পড়লো। কেমন করে তালাক থেকে বউকে বাঁচান যায়? অনেক আলেম উলামার কাছে ছোটাছুটি করলো। কিন্তু তার পক্ষে কোন ফতোয়া পাওয়া গেল না। সবাই বললো, "এই বউকে তালাক থেকে আর বাঁচানো যাবে না। যদি এভাবে কথা বন্ধ রাখে তবে ফজরের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বউ তালাক হয়ে যাবে।"

অবশেষে লোকটি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে তার দুঃখের কথা ব্যক্ত করলো, "হুযুর এই বউ তালাক হয়ে গেলে আমি বাঁচবো না। আমাকে রক্ষা করুন।"

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বললেন, "তোমার বউ তালাক হবে না। তুমি বাড়ী যাও। বউ তোমারই থাকবে"।

এই ফতোয়া শুনে আলেম-উলামা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, "যে ইমামকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি তিনি একজন সামান্য

ব্যক্তির দুঃখ দেখে স্থির থাকতে পারলেন না? শরীয়তের মাসআলাকে হেরফের করে ফতোয়া দিয়ে দিলেন"?

কিন্তু ব্যাপারটি ঘটলো অন্যভাবে। বিজ্ঞ ইমামের পক্ষেই শুধু এরূপ জটিলকে সহজ করা সম্ভব ছিল।

লোকটির বাড়ির কাছে একটি মসজিদ ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ফ জর হওয়ার আগেই সেই মসজিদে গিয়ে উচ্চস্বরে আযান দিতে ল গলেন।

বউটি আযান শোনা মাত্র আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে স্বামীকে ডেকে বলতে লাগলো, "আমার তালাক হয়ে গেছে। আমার বিদায়ের ব্যবস্থা করুন"।

লোকটি বললো, "কেমন করে হলো তোমার তালাক?"

বউ বললো, "ঐ দেখুন মসজিদে ফজরের আযান হচ্ছে। আমি ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত কথা বলা বন্ধ রেখেছিলাম তাই সেই কথা অনুযায়ী তালাক হয়ে যায়"।

লোকটি আবার চিন্তায় পড়ে গেল। ইমাম সাহেবের কণ্ঠে আযানের আওয়াজ শুনে মসজিদের দিকে ছুটে গেল।

বললো, "হুযুর আপনি বললেন, বউ তালাক হবেনা কিন্তু বউ তো তালাক হয়ে গেল। এখন আমি কি করি?"

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে তালাক হলো?"

লোকটি বললো, "এই যে ফজরের আযান হয়ে গেল এর আগ পর্যন্ত সে কথা বন্ধ রেখেছিল।"

ইমাম সাহেব বললেন, "এই আযানের পরে কথা বলেছে কিছু?"

লোকটি বললো "জী হাঁ আযানের পরে কথা বলেছে।"

ইমাম সাহেবঃ তবে ঠিক আছে। তোমার বউ তালাক হয়নি। ফজরের আযানের এখনও দেরী আছে। তার আগেই তোমার বউ কথা বলে ফেলেছে। যে-আযান শুনে কথা বলেছে সেটা ছিল তাহাজ্জুদের আযান।

লোকটি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। বাড়ী গিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরে বললো, সে তাহাজ্জুদের আযান শুনে কথা বলে ফেলেছে।

সব কিছু শুনে বউটি হতভম্ব আর আলেমগণ হতবাক!

——আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-২৩৪।

দুই শহরের তিন বোকা

সিরিয়ায় হেমস্ নামে এক শহর আছে। সেখানকার লোকেরা বোকা হিসাবে প্রসিদ্ধ। একদিন এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দেখে এক মুয়াজ্জেন ছুটিতে গিয়েছে আর আযান দেওয়ার জন্যে মসজিদে এক ইহুদীকে রেখে গেছে। ইহুদীটি আযান দিল বটে কিন্তু

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল) এর স্থলে বলছে

اَهْلُ الْقَرْيَةِ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ

(এই মহল্লার লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল)

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো- "আযানের কথায় এই পরিবর্তন কেন"?

ইহুদী জওয়াব দিল, "আমি মুহাম্মদ (দঃ) এর রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি না। তাই এই কৌশল"।

☆

এই হেমস্ শহরের আরেকটি ঘটনা।

এক ইমাম নামাজ পড়াচ্ছিল। সবকিছু ঠিকমত আদায় করছিল; কিন্তু একপাশ থেকে একটি পা তুলে রেখেছিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, "নামাযের মধ্যে এক পা তুলে রাখার মানে "?

ইমাম সাহেব বললেন, "এই পায়ে ছিঁটা জাতীয় কিছু লেগে নাপাক হয়ে পড়েছিল। ধোয়ার অবসর পাইনি। তাই নামায থেকে পা-টা পৃথক করে রেখেছিলাম"।

☆

ঝাঁসি শহরের এক বুযুর্গ বয়ান করেন যে এক ব্যক্তি নামাযের ইমামতি

করতে গিয়ে ছোহ সেজদা করলো। কিন্তু প্রকাশ্য দৃষ্টিতে নামাযে কোন ভুল ছিল না। সবাই জিজ্ঞাসা করলো - কী হয়েছিল ?

বললো, "একটি হালকা পাদ বাহির হয়ে গিয়েছিল। তাই ছোহ সেজদা করে নিলাম।"

সুতরাং এই ধরণের বোকাও সমাজে রয়ে গেছে।

—আল- এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খন্ড ৬, পৃষ্টা ২৯৮।

এক চোখ কানার দুঃখ

বেদআতীগণ এলেম অর্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিত। হক্কানী আলেমগণ তাদেরকে জাহেল ভাবতে পারেন তাই গালাগালি করে জয়ী হওয়াই তাদের ইচ্ছা। তাদের রচিত কেতাবপত্রেও কোন তথ্য থাকেনা। শুধু আলেমদের প্রতি গালাগালিতেই ভরপূর থাকে। তাদের অবস্থা হলো এক-চোখ কানা ব্যক্তির মত।

এক ব্যক্তির এক চোখ কানা ছিল। সে লোক-মুখে শুনেছিল যে যার এক চোখ কানা সে হারামজাদা হয়। সেইদিন থেকে তার মনে খুব দুঃখ ছিল।

একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো দুই চোখওয়ালা এক ব্যক্তি। তাকে দেখতে পেয়েই বলতে লাগলো, "তুঁই হারামজাদা, তোর বাপ হারামজাদা, তোর চৌদ্দ পুরুষ হারামজাদা।"

লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে বললো, "কেন ভাই, আমি নিরীহ মানুষ পথ দিয়ে যাচ্ছি -- আমাকে গালাগালি করছো কেন "?

সে বললো, "সবাই বলে যে, যার এক চোখ কানা সে হারামজাদা। সুতরাং তুমি যখন আমার এক চোখ কানা দেখেছো তখন হতে পারে মনে মনে আমাকে হারামজাদা বলেছো। তাই তার জওয়াবে আমি বলেছি --

"তুঁই হারামজাদা, তোর বাপ হারামজাদা, তোর চৌদ্দ পুরুষ হারামজাদা।"

ঠিক সেই রকম এই বেদআতীরা নিজেদের এলেমের ঘাটতি পূরণ করার জন্যে হক্কানী আলেমদেরকে গালি দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এদের চিকিৎসা হবে কিভাবে ?

—-আল- এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭১।

জাহেল মুজাদ্দেদ

আজকাল ব্যাঙের ছাতার মত সব বই লেখক গজিয়ে উঠেছে। জাহেল লোকও কোরআন এবং হাদীসে হস্তক্ষেপ করে বই লিখে চলেছে। ফলে দীনী আহ্কামের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

এভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদাহরণ হলো সেই 'বুক বইন্ডারের" মত যার কাছে এক ব্যক্তি কোরআন শরীফ বাঁধাই করতে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটির জানা ছিল যে তার কাছে কেতাব বাঁধাই করতে দিলে সে ঐ কেতাবে কিছু-না-কিছু সংশোধন করে দেয়।

সুতরাং লোকটি আগে থেকেই 'বুক বাইন্ডার'কে বললো, "দেখ ভাই, আমি একটি বাঁধাইয়ের কাজ করাবো। কিন্তু শুনেছি তোমার নাকি বাঁধাইয়ের সাথে সাথে লেখাতেও কিছু সংশোধন করার অভ্যাস আছে। তাই আমার অনুরোধ, এটা আল্লাহ্র কালাম, এখানে কোন কাট-ছাঁট করতে যেয়োনা।"

বুক বাইন্ডার বললো, "আগে অভ্যাস ছিল। এখন ওসব ছেড়ে দিয়েছি। আপনি সম্পুর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন"।

নির্দিষ্ট তারিখে লোকটি কোরআন শরীফ ফেরত নিতে এসে বললো, "কী ভাই কোন কাট-ছাঁট করনি তো ?"

সে বললো, "জীনা। তবে কয়েকটি ভুল ছিল খুব মারাত্মক। ঐগুলি শুদ্ধ না করে পারলাম না।"

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, "কেন ? কী ভুল ছিল ?"

সে বললো, "এক জায়গায় خَرَّ مُوْسٰى (খার্‌রা মূসা--মূসা (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়লেন) লিখা ছিল। কিন্তু خر (খার- গাধা) তো ঈসা (আঃ) এর ছিল। সুতরাং এই ভুল কিছুতেই রেখে দেওয়া যায় না। তাই আমি خَرَّ عِيْسٰى (খার্‌রা ঈসা--ঈসা (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়লেন) লিখে দিয়েছি।

"আরেক জায়গায় লিখা ছিল عَصٰى اٰدَمُ (আছা আদামু--আদম (আঃ) ভ্রান্তিতে পতিত হলেন); অথচ عَصٰى (আছা- লাঠি) ছিল মূসা (আঃ) এর। তাই আমি সংশোধন করে সেখানে عَصٰى مُوْسٰى (আছা মূসা - মূসা (আঃ) অমান্য করলেন) লিখে দিয়েছি।

"এক জায়গায় ছিল ولقد نادانا نوح (নাদানা নূহুন- নূহ (আঃ) আমাকে ডাকলেন); কিন্তু নূহ (আঃ) নাদান (মূর্খ) হন কি করে ? আমি সহ্য করতে না পেরে সেখানে লিখে দিয়েছি دانا نوح (দানা নূহুন--নূহ্ (আঃ) জ্ঞানী)।

আরেকটি বিষয় ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। সেটা হলো এই যে সেখানে জায়গায় জায়গায় ফেরআউন, হামান, কারূন, ইত্যাদি কাফেরের নাম লেখা ছিল। পবিত্র কালামে কাফের এবং শয়তানের নামে দরকার কি ? আমি সেখানে কেটে তোমার এবং আমার নাম লিখে দিয়েছি।"

লোকটি এইসব কথা শুনে অবাক।

আজকালকার দীনী কেতাব প্রণেতাদের অবস্থা হলো এইরূপ। এরা

নিজেকে গ্রন্থ প্রণেতা (তথা মুজাদ্দেদ) বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু আসলে এরা ইসলাম এবং মুসলমানদের দুশমন।

--আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খন্ড ৭ পৃষ্ঠা ১১৯। ঐ খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৬।

কুকুর তাড়ানো পীর

এটা হলো প্রতারণার যুগ। আগেকালের যুগে এরূপ ছিল না। বেদআতীগণও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতো। ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু না কিছু দীনী আছর পাওয়া যেতো। কিন্তু আজকালের বেদআতীগণ প্রতারণা, ফাসেকী, ফাজেরী সহ নানা প্রকার কবীরা গুনাহ্‌তে জড়িত হয়ে পড়েছে। রোজগারের নানা রকম কৌশল উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

এইরূপ এক বেদআতী পীরের ঘটনা আছে।

এক গৃহবধূ এই পীরের মুরীদ ছিল। মুরীদনীর বাড়ী গিয়ে পীর মেহমান হয়ে বসলো। দস্তরখানার সামনে বসে ভাবতে লাগলো কিভাবে অধিক মুরীদ পাওয়া যায়। হঠাৎ উঠে একটা লাঠি নিয়ে ছুটতে লাগলো। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। সাজোরে মাটিতে বাড়ি দেয় আর বলে, "খবীছ, দূর হ এখান থেকে, বাহির হয় এখান থেকে, নাপাক"!

এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে আবার এসে খেতে বসলো। মুরীদনী বললো, "কি হয়েছিল মিয়াঁ সাহেব" ?

'পীর' বললো, "কা'বা ঘরে কুকুর ঢুকে পড়েছিল। বাহির করে দিলাম।"

মুরীদনী ভাবলো পীর সাহেব 'হাকীকত' প্রাপ্ত হয়েছেন বটে! পরীক্ষা করা দরকার।

গৃহবধূটি ছিল খুব বুদ্ধিমতী। পীর সাহেবের সামনে ভাত রাখলেন।

পীর সাহেব ভাতের প্লেট সামনে নিয়ে বসে রইলেন। মুখে ভাত দেন না। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর মুরীদনী জিজ্ঞাসা করলো, "কি হয়েছে মিয়াঁ সাহেব ? ভাত খাচ্ছেন না কেন ?"

'পীর' বললেন, "তরকারী দিচ্ছ না যে ? তরকারী ছাড়া ভাত খাই কি দিয়ে ?"

মুরীদনী বললো, "এত দূরে কা'বা শরীফে কুকুর ঢুকেছে দেখতে পেলেন আর সামনে প্লেটে ভাতে ঢাকা তরকারী দেখতে পান না ?"

পীর মুরীদনীর কৌশল বুঝতে পারলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। জীবনে এরূপ কাজ আর করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

সুতরাং এদেরকে এভাবেই জব্দ করা উচিৎ।

–আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্

হক্কানী পীরের পরিচয় ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২ নম্বর কাফন চোর

যারা বিপ্লব সাধনের জন্যে আন্দোলন করে চলেছে আমরা তাদের বিরোধিতা করি না। তবে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে যেন ভালটা আসে, মন্দটা না আসে। এখন যারা ক্ষমতায় আছে আমরাও তো বলি যে তারা খারাপ। কিন্তু এদের চেয়ে খারাপ যদি ক্ষমতায় আসে তখন এরা যে কত ভাল তা' মনে পড়ে যাবে।

যেমন এক কাফন চোর ছিল সে কবর খুঁড়ে কাফনের কাপড় নিয়ে যেতো। মানুষ তার উপরে খুব বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তার মৃত্যুর জন্যে সবাই দোয়া করতে লাগলো।

অবশেষে সে একদিন মারা গেল।

কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার ছেলে এ কাজটি শুরু করে দিল। সে কাফন

চুরি করতো এবং অতিরিক্ত আরেকটি কাজ করে পালাতো। অর্থাৎ কাপড় খুলে নেওয়ার পর লাশের পাছায় একটি লোহার পেরেক ঠুকে যেতো।

তখন লোকেরা তার বাপকেই ভাল বলতে লাগলো যে আগের চোরটাই ভাল ছিল। সে শুধু কাফনই চুরি করতো, লাশের সংগে এই অনর্থক আচরণ করতো না। আর এই জালেমটা কাফনও চুরি করে আবার এই অনর্থক কাজটিও করে যায়।

সুতরাং দেশের ব্যাপারেও যেন সে রকম না হয়। বিপ্লব করতে গিয়ে যেন এদের আসনে অধিক খারাপটি না আসে।

——আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্;খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৩।

উস্তাদজীর কান্না

আজকালকার উন্নতি মানে হলো একজনের উন্নতি এবং তার কারণে দশ জনের অবনতি। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে পড়ে।

এক মিয়াঁজী এক ব্যক্তির বাড়ীতে ছেলে-পেলে পড়াবার কাজ করতেন। বাড়ীওয়ালা বিদেশে গিয়ে বিরাট এক চাকুরী পেয়ে বসলো। অনেক টাকা বেতন। এই সুসংবাদ জানিয়ে সে বাড়ীতে চিঠি লিখলো। চিঠি কেউ পড়তে পারতো না। চিঠি পড়ে শোনাবার জন্যে অবশেষে তারা উস্তাদজীর কাছে নিয়ে গেল। উস্তাদজী চিঠি পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বাড়ীর সবাই উস্তাদজীকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, “তোমরাও কাঁদ—— পরে বলবো।”

বাড়ীর সবাই কাঁদতে লাগলো।

কান্নার আওয়াজ শুনে পাড়ার সবাই ছুটে আসলো। কান্নার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলো। মোল্লাজি বললেন, “তোমরাও কাঁদ।”

পাড়ার লোকেরাও কাঁদতে লাগলো। হাঁউ-মাউ রবে সারা মহল্লা ভারী

হয়ে উঠলো।

যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং কান্নার রোল স্তিমিত হয়েছে তখন সবাই মোল্লাজীকে জিজ্ঞাসা করলো, "হুযূর, এই কান্নার কারণ কি ?"

উস্তাদজী বললেন, "বাড়ীওয়ালার চিঠি এসেছে। তিনি বড় ধরণের একটা চাকুরী পেয়েছেন এবং অনেক টাকা বেতন হয়েছে।"

লোকেরা বললো, "এটাতো আনন্দের কথা। কান্নার তো কোন কারণ দেখি না।"

উস্তাদজি বললেন, "তোমরা বুঝতেই পারছো না! যখন এত টাকা বেতন হয়েছে তখন তিনি ছেলেদেরকে আর আরবী পড়াবেন না। বাড়ীতে মাষ্টার রাখবেন। আমার চাকুরী যাবে। তাই আমার কান্না।

"বাড়ীওয়ালীর স্থলে নতুন যুবতী বউ ঘরে আসবে। সংসার ভাঙ্গবে। তাই বাড়ীর সকলের কান্না।

"মহল্লায় এসে যখন তিনি বসবাস শুরু করবেন তখন তার আরবী ঘোড়া এবং মটরগাড়ী রাখার জন্যে পাড়ার লোকদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। তার বাড়ীটি বিরাট হবে। আর পাড়ার লোক হবে ভিটা ছাড়া, রাস্তা হারা। সুতরাং পাড়ার সবাই না কেঁদে পারে না"।

অতঃপর বিশেষ ব্যক্তির উন্নতিই যে সাধারণ মানুষের অবনতির কারণ ঘটনাটি তার একটি সুন্দর চিত্র।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯।

স্বচ্ছ আয়নায় হাবশীর চেহারা

আজকাল নতুন নতুন মুজতাহেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত 'কেয়াস'-এর শ্লোগান দিয়ে এরা মানুষের আখেরাত বরবাদ করে চলেছে। মানুষের বুঝা জিনিষকে এরা নতুন করে বুঝাতে চেষ্টা করছে। নিজেদের ত্রুটি নিজেদের মধ্যে না দেখে পবিত্র শরীয়তের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। ফলে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশকে কাট-ছাঁট করার চেষ্টায় মেতেছে।

এক হাবশী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে একটা আয়না পড়ে ছিল। আয়নাটি হাতে নিয়ে তার দিকে তাকালো। নিজের বিশেষ চেহারাটি আয়নায় দেখতে পেলো। হাবশীদের চেহারা অত্যন্ত কালো এবং বিশ্রী হয়ে থাকে। মোটা ঠোঁট দেখে সে চিৎকার করে উঠলো, "কমবখ্‌ত তোর মত বদছূরত লোক আর হয় না।" আয়নাটি দূরে ছুঁড়ে মারলো। "যদি এত বিশ্রীই না হতিস তবে কি কেউ তোকে এখানে ফেলে যায়" ?

এখন বলুন দেখি, আয়নাটি বিশ্রী ছিল না সে নিজেই কুৎসিত ছিল ?

সুতরাং লোকটি যেমন স্বচ্ছ আয়নার মধ্যে খুঁত দেখতে পেয়েছে তেমনি এরাও পবিত্র শরীয়তের মধ্যে খুঁত দেখতে পায়।

—–আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২২।

এদের অবস্থার আরেকটি উদাহরণ হলো 'ঈদের চাঁদ' গল্পটি।

১৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

বিড়ালের পরীক্ষা

উস্তাদহীন ব্যক্তি সাধারণতঃ ঢিলা মেজাজের হয়ে থাকে। কারণ তারা কোন মুহাক্কেক আলেমের সান্নিধ্যে থেকে তরবিয়ত হাছেল করেনি। রূহানী শক্তি তাদের থাকে না। সুযোগ পেলেই গুনাহ্ করে বসে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কোন গায়েবী সাহায্য তারা পায় না। সকল তাকওয়া ও পরহেজগারী একদিকে পড়ে থাকে আর লোভী বিড়ালের মত তারা অন্য দিকে ছুটে যায়।

এক বাদশাহ্ এক বিড়ালকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাত্রে বিড়ালটি মাথায় চেরাগ নিয়ে বসে থাকতো। বাদশাহ্ চেরাগের আলোতে বসে কাজ করতেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে বিড়ালের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছে তখন একদিন মন্ত্রীর কাছে বলতে লাগলেন-- বিড়ালটি শিক্ষিত, খুব শান্ত, প্রদীপ মাথায় ঠাঁয় বসে থাকে ইত্যাদি।

মন্ত্রী বললেন, "হুযূর, বিড়ালের পরীক্ষা করা দরকার।"

বাদশাহ্ বললেন, "এর আবার পরীক্ষা কেমন?"

মন্ত্রী একটি ইঁদুর ধরে লুকিয়ে রাখলেন। বাদশাহ্ রাত্রে যখন চেরাগের আলোতে বসে কাজে মশগুল মন্ত্রী তখন বাদশাহ্র কক্ষে ইঁদুরটি ছেড়ে দিলেন। বিড়ালটি ইঁদুর দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চেরাগ আর কোথায় বিড়াল। একদম সব ওলট পালট হয়ে গেল। চেরাগ ফেলে দিয়ে বিড়াল ছুটলো ইঁদুরের দিকে। চেরাগের আগুনে বাদশাহ্র নথিপত্র পুড়ে ছাই। বিড়ালের দুই বৎসরের প্রশিক্ষণ মুহূর্তের মধ্যে খতম।

উস্তাদের সান্নিধ্য এবং তরবিয়তহীনদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। এদের কোন কথা নির্ভরযোগ্য নয়। এদের কোন কাজের উপর ভরসা করা চলে না।

--আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৭৯।

শেখ চাল্লীর ঘটনা

আল্লাহ্‌র ওলীদের সান্নিধ্যে যাবো না, তাদের কথা মত চলবো না, তাদের তিরস্কার শুনবো না, অর্থাৎ কোন কাজই করবো না অথচ আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে যাবো---এরূপ আশা করা শেখ চাল্লীর কল্পনা মাত্র। শেখ চাল্লীর একটি ঘটনা আছে।

এক ব্যক্তি তেলের একটি হাঁড়ি বহন করার জন্যে কুলির খোঁজ করছিল। হঠাৎ শেখ চাল্লীকে দেখতে পেলো। বললো, "আমার এই তেলের হাঁড়িটা বাড়ী পৌঁছে দাও, তোমাকে দুইটি পয়সা দিব।"

শেখ চাল্লী খুশী হয়ে তেলের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে লোকটির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলো।

মনে মনে ভাবলো — তেলের হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে দুইটি পয়সা পাবো, তা' দিয়ে ব্যবসা করাই উচিৎ। দুই পয়সায় দুইটি ডিম কিনবো। ডিম দুইটি প্রতিবেশীর মুরগীর নীচে রেখে তা' দিব। দুইটি বাচ্চা ফুটবে। একটি মোরগ, একটি মুরগী। এই জোড়া থেকে অনেকগুলি ডিম হবে। সেই ডিম থেকে অনেকগুলি মুরগী হবে। সেই মুরগী বিক্রী করে একটি বকরী কিনবো। বকরী থেকে অনেকগুলি বাচ্চা হবে। বকরীর পালে মাঠ ভরে যাবে। অতিরিক্ত বকরী বিক্রী করে গরু কিনবো। গরুতে যখন মাঠ ভরে যাবে তখন অতিরিক্ত গরু বিক্রী করবো। মহিষ কিনবো। তারপর আরবী ঘোড়ার ব্যবসা করবো। অনেক টাকা জমা হবে। তখন একটা বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করবো। কোন বিত্তবানের কন্যা বিয়ে করে নিয়ে আসবো। ছেলে পয়দা হবে। ছেলে যখন বড় হবে তখন আমাকে ডাকতে আসবে– 'আব্বাজান আপনাকে আম্মাজান ডাকছেন'। তখন আমি ধমক দিয়ে বলবো, 'ধেৎ, আমি এখন যেতে পারবো না; কাজের চাপে আমার অবসর নাই।'

এই 'ধেৎ' বলার সময় অসতর্ক মাথা যেই দোলা খেয়েছে অমনি মাথার হাঁড়ি পড়ে গিয়ে সমস্ত তেল মাটিতে গড়াতে শুরু করে দিয়েছে।

মালিক ক্রোধে ফেটে পড়লো– "তোর কান্ড জ্ঞান নাই, আমার এতগুলি তেল নষ্ট করলি ?"

শেখ চাল্লী বললো, "আরে সাহেব রাখেন আপনার তেল! আপনার তো সামান্য তেল নষ্ট হয়েছে। আর আমার ? আমার মনোরম অট্টালিকা, বিরাট ব্যবসা, লক্ষ-কোটী টাকা আর গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে সেদিকে একটুও দেখলেন না ?"

কিন্তু তবু এই শেখ চাল্লীর মত অনর্থক কল্পনাকারী কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে--ব্যবসাও নাই, হাতীও নাই, ঘোড়াও নাই, মুরগীও নাই। কেক নাই, বিস্কুট নাই, মাখন নাই--মোটকথা কোন কিছুই নাই। যা–কিছু ছিল সবই স্বপ্ন ছিল। কেউ গর্ব করেছে সৌন্দর্য্যের, কেউ গর্ব করেছে সম্মানের, কেউ গর্ব করেছে এলেমের, কেউ গর্ব করেছে পরহেজগারীর। সেখানে প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। অনর্থক কল্পনায় বিভোর থেকে আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়ার ফল বুঝা যাবে। আরে হতভাগা, কি রয়েছে এই ক্ষণিকের জীবনে ?

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"যা কিছু তোমাদের কাছে আছে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বাকী থাকবে (তোমাদের সওয়াবগুলি) যা' আল্লাহ্‌র কাছে (জমা)আছে।"

মাথা ছাড়া বাঘ

এক ব্যক্তির সৌন্দয্য চর্চ্চার সাধ জেগেছিল। সে তার দেহে বাঘের ছবি এঁকে নিতে ইচ্ছা করলো। এক শিল্পীর কাছে গিয়ে বললো, "আমার

কোমরে একটি বাঘের ছবি উল্কি করে এঁকে দাও।"

শিল্পী উল্কির সুঁই তার কোমরে ফুটালো। লোকটি চিৎকার করে উঠলো, "ওরে বাবারে মরেছি, তুমি কী আঁকছো যে এত ব্যথা ?"

শিল্পী বললো, "বাঘের লেজ আঁকছি।"

লোকটি বললো, "লেজ ছাড়া বাঘ হয় না ? আমার জান বাহির হয়ে যাবে। অন্য কিছু আঁক।"

শিল্পী এবার অন্য জায়গায় সুঁই ফুটালো। লোকটি চিৎকার করে বললো, "কী আঁকছো ?"

শিল্পী বললো, "বাঘের পেট আঁকছি।"

লোকটি বললো, "পেট আবার কী দরকার ? এই বাঘতো কোন কিছু খাবে না!"

শিল্পী পেট আঁকা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সুঁই ফুটালো। লোকটি তেড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলো, "এবার কী আঁকা হচ্ছে ? এত যন্ত্রণা কেন ?"

শিল্পী বললো, "বাঘের মাথা আঁকছি।"

লোকটি বললো, "মাথা আঁকতে হবে না। জান বাহির হয়ে যাবে। অন্য কিছু আঁক।

"কিন্তু যে-বাঘের লেজ নাই, পেট নাই, মাথাও নাই সেই বাঘটি কেমন বাঘ হবে ? এরূপ বাঘতো আল্লাহ্‌ও কখনো পয়দা করেননি, আমি কি করে বানাবো "? শিল্পী বিদায় হলো।

সুতরাং তুমিও ওলীয়ে কামেল হতে পারো না, যতক্ষণ না পীরে কামেলের সান্নিধ্যে থেকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছো।

قال را بگذار مرد حال شو
پیش مرد کاملے پامال شو

"কে কী বলছে, কে কী করছে সেদিকে দেখিও না, 'হাল' বিশিষ্ট মোমেন হয়ে যাও। আর কোন কামেল ওলীর খেদমতে নিজেকে পামাল করে দাও"

--আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৭।

পোলাউয়ের সুগন্ধি

হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নত বটে; কিন্তু বুযুর্গানে দীন যে কোন ধরণের হাদিয়া গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন না। যেমন ঃ

এক বুযুর্গ ক্লাসে হাদীস পড়াচ্ছিলেন। খাদ্যের অভাবে তিনি কয়েক দিন উপবাস ছিলেন। তবু ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা কাউকে প্রকাশ করেন নি। ছাত্ররা চেহারা দেখে বুঝে নিল হুযুর ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি একজন ছাত্র ক্লাস থেকে বাহিরে চলে গেল । কিছুক্ষণ পর ডালা বোঝাই করে উন্নত মানের খাবার নিয়ে হাজির হলো। বললো, "হুযুর এগুলি গ্রহণ করুন।"

পোলাউয়ের সুগন্ধ তখন সারা কক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। বুযুর্গ বললেন, "ফিরিয়ে নিয়ে যাও, এগুলি আমি গ্রহণ করবো না"।

ছাত্ররা অবাক! কেন এই হাদিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে না তারা কোন কারণ খুঁজে পেল না। উস্তাদের হুকুম অমান্য করা বেয়াদবী তাই ছাত্রটি খাবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ছাত্রটি ঐ একই খাবার আবার নিয়ে হাজির হলো। বললো, "হুযুর এগুলি নিন।"

বুযুর্গ এবার খাবার দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন এবং আহারের পর তৃপ্তির সাথে আল্লাহ্ পাকের শুকুর করলেন। ছাত্ররা এবার আরয করলো, "হুযুর , যে-খাবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই একই খাবার দ্বিতীয়বার হাজির করায় গ্রহণ করলেন---এর কারণ বুঝতে পারলাম না।"

বুযুর্গ বললেন," হাদীস শরীফে আছেঃ

مَا اَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ .

"জিনিষ পাওয়ার জন্যে মনে মনে অপেক্ষা থাকে না সেইরূপ হাদিয়া গ্রহণ কর। "

"তাই তোমরা যখন আমার ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা বুঝতে পেরে ক্লাস থেকে বাহিরে গেলা তখন আমি ভাবলাম হয়তো খাবার আন্‌তে গিয়েছ। আমার মন তখন খাবারের অপেক্ষা করছিল। তাই খাবার পৌঁছার পর তা' প্রত্যাখ্যান করলাম।

"প্রত্যাখ্যান করা খাদ্য আবার ফিরে আসবে একথা আমি কখনও ভাবিনি। তার জন্যে মনে মনে অপেক্ষাও ছিল না। কাজেই তখন সেই হাদিয়া গ্রহণ করলাম"।

--আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্;খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫২।

'ইনশা আল্লাহ্'-র বরকত

আজকাল তৌবা, দোয়া এবং বিনয় একেবারে বিদায় হয়ে গেছে। দুনিয়াদারদের কথা কী বলবো, দীনদারদের মধ্যেও এই জিনিষ পাওয়া যায় না। কেমন যেন উদাসীনতা আর রুক্ষতা চেপে বসেছে। এই কারণেই কোন কাজে বরকত এবং মজা পাওয়া যায় না।

অথচ তৌবা এবং দোয়া এই দুইটি জিনিষ বিপদ এবং মুছিবতের মুকাবিলায় ঢাল এবং অস্ত্রের কাজ দেয়। বিপদে পড়লে তখন এসব মানুষের হুশ হয়। যেমন একটি লোক হাটে যাচ্ছিল গরু কিনতে।

রাস্তায় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, "কোথায় যাচ্ছো ?"

বললোঃ গরু কিনতে।

লোকটি বললোঃ ভাল কাজে 'ইনশা আল্লাহ্' বলতে হয়।

সে বললোঃ এতে আবার ইনশা আল্লাহ্ বলার কী আছে ? আমার পকেটে টাকা আছে, হাটে আছে গরু। যাবো আর কিনবো। এতে আবার ইনশা আল্লাহ্ বলতে হবে কেন ?

বেচারা লোকটি চুপ হয়ে গেল।

অতঃপর হাটে গিয়ে সে একটি গরু পছন্দ করলো। দাম-দর ঠিক করে টাকার জন্যে পকেটে হাত দিল। পকেটে হাত নীচের দিক দিয়ে বাহির হয়ে পড়লো। টাকা নাই। পকেট কেটে নিয়ে গেছে। হায়রে ইনশা আল্লাহ্! একি হলো? পকেটে হাত ঝুলাতে ঝুলতে লোকটি ফিরে যাচ্ছিল। রাস্তায় সেই লোকটির সাথে আবার দেখা। জিজ্ঞাসা করলোঃ কি ভাই, গরু কেনা হয়েছে?

বললোঃ কী আর বলবো, ইনশা আল্লাহ্!

ঃ কেন? কি হয়েছে?

ঃ হাটে গেলাম ইনশাআল্লাহ্।

ঃ তারপর?

ঃ গরু পছন্দ করলাম ইনশাআল্লাহ্। দাম-দর ঠিক হলো ইনশাআল্লাহ্! টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়েছি ইনশাআল্লাহ্! কিন্তু পকেটমার কেটে নিয়েছে ইনশাআল্লাহ্! গরু কেনা হয়নি ইনশাআল্লাহ্! বাড়ী ফিরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ্!

এইভাবে হাত দুলাতে দুলাতে এবং ইনশাআল্লাহ্ বলতে বলতে লোকটি বাড়ী ফিলে গেল।

কিন্তু এখন আর ইনশাআল্লাহ্ বলে কি হবে? আগেই বলা উচিৎ ছিল।

—আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫২।

দুই বন্ধুর কীর্তি

আমাদের দেশের অনেক মুসলমান এমন আছেন যারা ইসলামী আমল-আখলাক নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত না করে সব দায়িত্ব

আলেমদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দূরে সরে রয়েছেন। অথচ ইসলামের সুযোগ-সুবিধা সবটুকুই তারা ভোগ করতে চান।

এদের উদাহরণ হলো সেই দুই ব্যক্তির ন্যায় যারা একটি সফরে যাত্রা করেছিল। পথিমধ্যে দুইজনই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। তখন তারা স্থির করলো রান্না করবে।

একজন বললোঃ আমি বাজারে গিয়ে সওদা নিয়ে আস্‌ছি, তুমি ততক্ষণ জঙ্গল থেকে কিছু জ্বালানি কুড়িয়ে নিয়ে এস।

দ্বিতীয় জন বললো ঃ দোসত্‌, তুমি জান না আমি এই বিরাট সফরের দ্বারা কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে এখন জ্বালানি কুড়ানো সম্ভব নয়।

প্রথম ব্যক্তি বেচারা নিজেই বাজার থেকে সওদা কিনে আনলো এবং নিজেই জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানি কুড়িয়ে নিয়ে আসলো। এর পর সে বললোঃ এবার ভাই তুমি আগুন ধরাও, আমি চাউলগুলা ধুয়ে নিই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললোঃ এতটা ধৈর্য্য কোথায় ? আমার শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে।

প্রথম ব্যক্তি কাজ দুইটি একাই করলো। এরপর বললোঃ আমি তরকারী কুটে নিচ্ছি, তুমি বসে বসে ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতে থাক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললোঃ বসে থাকা আমার পক্ষে মরণ। দীর্ঘ সফরে হেঁটে আমার পা দুইটা ব্যাথায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর প্রথম ব্যক্তি ভাত-তরকারী সব একাই রান্না করে বললোঃ এসো ভাই খাবার খেয়ে নাও।

তখন সে বললোঃ অনেকক্ষণ থেকে দোস্‌ত্‌ তোমার সব কথাই অমান্য করে আসছি। আর কত অমান্য করা যায় ? বার বার অমান্য করতে আমার লজ্জা লাগছে। দাও অন্ততঃ খাবারটা খেয়ে নেই।

——আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্‌, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৭।

জোর করে কথা বলানো ১

যদি কেউ কথা না বলাকে পছন্দ করে তবে তাকে জোর করে কথা বলানো উচিৎ নয়। তাতে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যেমনঃ

এক বউ বিয়ে হয়ে নতুন শ্বশুর বাড়ী এসে কোন কথা বলতো না। শাশুড়ী বললেন, "বউ তুমি কথা বল না কেন?"

বউ বললো, "আমার মা আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন যেন শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কোন কথা না বলি।"

শাশুড়ী বললেন, "তোমার মা কিছু জানেন না। তুমি এখন থেকে কথা বলিও।"

বউ বললো, "এখন থেকে তা'হলে কথা বলতে হবে?"

শাশুড়ীঃ "হাঁ, তুমি অবশ্যই কথা বলবা।"

বউ বললো, "আম্মা, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

শাশুড়ী বললেন, "হাঁ, হাঁ, প্রশ্ন কর। এই তো চাই!"

বউ বললো, "আচ্ছা আম্মা, যদি আপনার ছেলে মারা যায় আর যদি আমি বিধবা হয়ে পড়ি তবে কি আমার অন্য কোনখানে বিয়ে দিবেন, না এমনিই ঘরে বসিয়ে রেখে দিবেন?"

শাশুড়ীঃ হায় তৌবা! একী কথা? বউ, বরং তুমি চুপ থাক সেই ভাল। মা যে নিষেধ করেছেন কথা বলতে তা' ঠিকই করেছেন। তুমি বাছা আর কথা বলিও না।

জোর করে কথা বলানো ২

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর এরূপ একটি ঘটনা রয়েছে। তিনি ছাত্রদেরকে গভীর জ্ঞানের সুক্ষ্ম বিষয় থেকে নিয়ে বানান পর্যন্ত শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন কোন কথাই বলতো না। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তুমি কোন প্রশ্ন কর না কেন?"

ছাত্রটি বললো, "ঠিক আছে, তাহলে এখন থেকে প্রশ্ন করবো।"

একদিন এক মজলিসে ইমাম সাহেব একটি মাসআলা বয়ান করলেন, "সূর্য্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রোজা এফতার করে নেওয়া উচিৎ"।

ছাত্রটি বললো, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

ইমাম সাহেব বললেন, "অবশ্যই। তুমি জিজ্ঞাসা কর।"

ছাত্রঃ যদি কোন দিন সূর্য না ডোবে তবে কী করতে হবে?

ইমাম সাহেব বললেন, "তোমার বরং কথা না বলাই উচিৎ। তুমি চুপ করেই থেকো সেইটাই ভাল"।

—আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ২১১।

সুতরাং যে ব্যক্তি কথা বলতে চায় না তাকে জোর করে কথা বলালে নিরাশ হতে হয় এবং ব্যর্থ হয় তার সকল কথা।

জীবন চাই ভাবনাহীন

এক ব্যক্তি ছিল। তার খিযির (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার খুব সাধ জাগলো। এক দিন সত্যি সত্যি খিযির (আঃ) তার সামনে এসে হাজির হলেন এবং শুধালেন, "কেন এত সাধ হয়েছে এই সাক্ষাতের?"

লোকটি আরয করলো, "হুযূর আমাকে দোয়া করুন যেন আমি

নিশ্চিন্তে এবং নির্ভাবনায় জীবন যাপন করতে পারি।"

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, "এভাবে দোয়া নয়। বরং তোমার দৃষ্টিতে যাকে সুখী মনে হয় তুমি তার মত যেন হতে পার সেই দোয়া করিয়ে নাও।"

লোকটি রাজি হলো।

কিছু দিন পর জুয়েলারী দোকানের এক মালিককে আবিষ্কার করলো। এমন সুন্দর চেহারা, এত ভাল স্বাস্থ্য আর এমন হাসি মাখা মুখ কোথাও হয় না। ধন-সম্পদ, সুন্দরী-স্ত্রী-পুত্র এবং আরাম আয়েশের সকল বস্তুই তার আছে। দেখেই বুঝতে পারলো এর চেয়ে সুখী ব্যক্তি দুনিয়ায় আর একটিও নাই।

লোকটি ভাবলো, "আমাকে এর মতই হতে হবে। তবে দোয়া করানোর আগে লোকটির ভিতরের খোঁজ-খবর নেওয়া যাক, এমন যেন না হয় যে যদি গোপনে তার কোন শোক-দুঃখ থেকে থাকে তবে তা' আমার ভাগে পড়ে যায়।"

এই ভেবে লোকটি তার কাছে সাক্ষাৎ করে বললো "দেখুন আমি আপনার মত নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করার জন্যে খিযির (আঃ) এর কাছে দোয়া করাতে চাই। আমার দৃষ্টিতে আপনার মত সুখী ব্যক্তি আর একটিও নাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?"

মালিক এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "আর বলবেন না, ভাই! আমার সবই আছে। কিন্তু তবু এমন এক গোপন দুঃখে ডুবে আছি যা' ব্যক্ত করার নয়। আল্লাহ্ যেন আমার দুশমনকেও এই কষ্টটি না দেন।"

গোপন দুঃখটির বিষয়ে জানার জন্যে লোকটির আগ্রহ বেড়ে গেল।

তখন মালিক বলতে লাগলো, "স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভালবাসা ছিল প্রবল। ভালবাসায় একেবারে মত্ত হয়ে পড়েছিলাম। একবার স্ত্রীর অসুখ হলো। ভীষণ অসুখ। স্ত্রী আর বাঁচবেন না বুঝতে পারলাম। তাই তার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে কাঁদতে লাগলাম।

"স্ত্রী আমাকে শান্তনা দিয়ে বলতে লাগলেন, 'খামোখা কেঁদে মন

খারাপ করবেন না। আমার মৃত্যুর পরে আরেকটি বিয়ে করে নিবেন।'

আমি তাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলাম, 'এরূপ হতেই পারে না। তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কোন নারীকে পছন্দ করতে পারি না।'

''স্ত্রী বললেন, 'ওটা একটা কথার কথা মাত্র। সব ঠিক হয়ে যাবে। থাক কাঁদতে নাই।'

''আমি তাকে কী দিয়ে বিশ্বাস করাই ? মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিশ্বাস তাকে করাতেই জবে। সুতরাং আমার পুরুষাঙ্গটি কেটে তার সামনে রেখে দিয়ে বললাম, 'নাও এবার অবশ্যই বিশ্বাস হবে, তোমার মৃত্যুর পর কোন নারীকে আমার প্রয়োজন নাই।'

''কিন্তু কিছুদিন পর স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই সৌন্দর্য. সেই যৌবন, সেই মন কেড়ে নেওয়া চাহনি, সবই আছে তার, কিন্তু আমার কিছুই নাই। বাড়ীটা আমার মরুভূমি। তৃষ্ণার্ত এক চাতক পাখির মত সে আমার দিকে চেয়ে থাকে; আমি তাকে কিছুই দিতে পারি না।

''এখন যে কত দুঃখ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি তা' ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।"

অতঃপর ঘটনাক্রমে একদিন খিযির (আঃ) এর সঙ্গে আবার সেই লোকটির দেখা হলো। লোকটি আরয করলো, 'হুযুর, আমি বুঝতে পেরেছি এই দুনিয়ায় কেহ নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। আমাকে বরং পরকালের জন্যে দোয়া করুন। যেন আমার পরকাল ঠিক হয়ে যায়।

---আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৪।

বীরবলের সত্য কথা

দেশের চিন্তা এবং উন্নতির ভাবনা নিয়ে কিছু লোক মেতে উঠেছে এবং সবাইকে তাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করছে। তাদের যত চিন্তা হলো দেশের জন্যে আর জাতির জন্যে। কিন্তু নিজের জন্যে কি কোন চিন্তা করতে হবে না ? আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরে যে-চিন্তাটি বিরাজিত রয়েছে ওদের অন্তরে যদি সেই চিন্তার সামান্য ছোঁয়াও লাগতো তা'হলে সব আন্দোলন ভুলে যেতো, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। আর এই সব চিন্তার স্পর্শ নিজের চেষ্টায় অন্তরে বুলিয়ে নিতে হয়। এমনিতেই অন্তরে ভীড় করে না।

কিসের চিন্তায় হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলখী (রঃ) সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন ? তাঁর প্রধান মন্ত্রী দিশাহীন হয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন এবং সন্ধান পেয়ে বললেন, "হুযূর, রাজপ্রাসাদে ফিরে আসুন। সিংহাসন ও মুকুট সামলান। আমরা আর পারছিনা। মন্ত্রী-পরিষদ পেরেশান আর দেশের মানুষ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

তিনি বললেন "আমার নিজের ভাবনায় আমি মরে যাচ্ছি। এই ভাবনা যার অন্তরে আছে সে মানুষের সম্পর্কের এই হক আদায় করতে অপারগ।"

মন্ত্রী আরয করলেন, "কী সেই ভাবনা যার কোন চিকিৎসা হয় না ? আমাকে বলতেই হবে।"

বাদশাহ বললেন, "আল্লাহ যে কথাটি বলেছেন সেই কথা শোনার পর থেকে আমি নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছি। আল্লাহ বলেছেনঃ

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ–

'একটি দল থাকবে জান্নাতে আর এক দল যাবে দোযখে' (সূরা শূরা)।

"এখন আমি কোন দলে থাকবো ? এই ভাবনাটা আমাকে বিভোর করে তুলেছে। আপনি দূর করুন আমার এই দুঃখ।"

মন্ত্রী আরয করলেন, "হুযূর আমি আপনার দুঃখ কিভাবে দূর করবো ?

আপনার কথা শুনে আমিও ঐ একই ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমাকে রক্ষা করবে কে ?"

বাদশাহ্ আকবরকেও একবার এই ভাবনা পেয়ে বসেছিল। তিনি শাহী মহলের শয্যায় শুয়ে আরাম করছিলেন। চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকার। একটি মাত্র প্রদীপ বাদশাহ্র কক্ষকে আলোকিত করে রেখেছিল। হঠাৎ দম্কা হাওয়া এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। বাদশাহ্ দুই চোখে অন্ধকার দেখে শঙ্কিত হলেন। কবরের নির্জন অন্ধকারের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে ধন আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, আভিজাত্য আর সৈন্য সামন্ত সবই আছে কিন্তু আলো নিভে যাওয়ার এই বিভীষিকা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারলো না। তাহলে কবরে যেখানে এসব কিছুই থাকবে না, শুধু দুই গজ গর্তে নির্জনতা আর সীমাহীন অন্ধকার থাকবে সেখানে আমার কিরূপ অবস্থা ঘটবে ? চিন্তায় সারারাত ঘুম হলো না বাদশাহ্র।

চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে সকালে দরবারে হাজির হলেন। ভাবনার এক অদৃশ্য জগতে বিচরণ করছেন তিনি। চিন্তায় দেহ ও মন ভারাক্রান্ত। শাহী দরবার যেন সেই ভার বহন করতে পারছে না।

বীরবল আরয করলো, "হুযূর, আজ আপনাকে বড় চিন্তাক্লিষ্ট দেখা যাচ্ছে!"

বাদশাহ্ বললেন, "রাত্রে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটেছে যার দরুণ ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে পড়েছি। অন্তরকে কোন কুলে ভিড়াতে পারছি না।"

বীরবল আরয করলো "হুযূর এটা কোন ভাবনার বিষয় নয়। আমি একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রসূলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়াতে কত বৎসর অবস্থান করেছেন ?

আকবর বললেন, "তেষট্টি বৎসর।"

"আর ইন্তেকাল হয়েছে আজ কত বৎসর হলো "

আকবর বললেন, "এক হাজার বৎসরেরও বেশী।"

বীরবল আরয করলো, "তাহলে যিনি মাত্র তেষট্টি বৎসর দুনিয়ায় অবস্থান করে সারা দুনিয়াকে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন তিনি কি আজ এক হাযার বৎসর ধরে যমীনের নীচে অবস্থান করে যমীন গহ্বরকে উজ্জল

আলোতে ভরে দেননি ? কবর তো যমীনের নীচেই থাকে। সুতরাং সব মুসলমানই ইনশাআল্লাহ্ তার কবরকে উজ্জল আলোকে রৌশন দেখতে পাবে।"

বীরবল ছিল বটে হিন্দু ; কিন্তু কত বড় সত্য কথাটিই না সে বলেছে! অদ্ভূত তার সত্য প্রকাশের ভঙ্গিটি!

কিন্তু মুসলমান হওয়ার জন্যে চাই সেই চিন্তা যে-চিন্তা আকবরের ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিয়েছিল। আল্লাহর ভয়ের করাত আল্লাহ-ওয়ালাদের অন্তরকে অবিরত চিরে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। দুনিয়ার হাঙ্গামার দিকে ফিরে তাকাবার তাদের ফুরসুত হয় না। সুতরাং

"তলোয়ারের আঘাতে যারা জর্জরিত তাদের কষ্টের পরিমাপ তোমরা কি দিয়ে করবে ? একটি কাঁটা কখনো যে তোমাদের পায়েও ফুটে নি!"

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست
حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

—আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ; খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩।

আঙ্গুল চাটা চাটি

জাহেল পীরদের স্বভাব আশ্চর্য ধরণের। যখন যা' মুখে আসে বলে ফেলে। আর যা' ইচ্ছা তাই করে বসে।

এইরূপ এক জাহেল পীরের ঘটনা আছে। মুরীদ তার কাছে একটি স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে তা'বীর জানতে চাইলো। বললো, "হুযূর, গত রাত্রে আমি স্বপন দেখেছি যেন আপনার হাতটি একটি মধুর পাত্রে ডুবানো রয়েছে আর আমার হাত একটি পায়খানা ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবানো আছে"।

এতটুকু বলা হতে না হতেই পীর সাহেব আনন্দের আতিশয্যে স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠলো, "হবে না ? এইরূপই তো হবে! তুই যে গুনাহগার দুনিয়ার

কুকুর তাই তোর হাত নাপাক পাত্রে ডুবানো থাকবে। আর আমি যে বুযুর্গ আল্লাহ্‌র ওলী তাই আমার হাত মধুর পাত্রে ডুবানো থাকে।"

মুরীদ বললো, "হুযূর, স্বপ্নটি বলা এখনও শেষ হয়নি। তারপর দেখি আপনার হাতের আঙ্গুল আমি চাটছি, আর আমার হাতের আঙ্গুল আপনি চাটছেন"।

এই শুনে পীর সাহেব রেগে মেগে মুরীদকে যা' ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি করতে লাগলো।

কিন্তু মুরীদ স্বপ্ন দেখুক বা না-দেখুক, একটি খুব সত্য বিষয়ের নির্দেশনা দিয়েছে। কারণ পীর সাহেব মুরীদের সাথে সম্পর্ক জুড়েছিল দুনিয়ার স্বার্থের জন্যে যা' পায়খানার সমতূল্য। মুরীদের নাপাক হাত তাই পীর সাহেবকে চাটতে হয়েছে। আর মুরীদ পীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যা' মধুর সমতূল্য। তাই মুরীদ মুধুতে ডুবানো পীরের হাত চেটেছে।

—আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ ; খন্ড ৩. পৃষ্ঠা ৪৯।

হক্কানী পীরের পরিচয় ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সুন্দর এই বাংলাদেশটা

যারা আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে তারা নিজেদের গ্রেফতার হওয়াকে একটা গর্বের বিষয় বলে মনে করে। শত অপমানেও তাদের কিছু যায় আসে না।

আফগান থেকে এক কাবুলিওয়ালা এদেশে বেড়াতে এসেছিল। এক মিষ্টির দোকানদার মিষ্টি সামনে নিয়ে বসে আছে অথচ খাচ্ছে না দেখে সে নিজেই দুই হাতে মুখে পুরতে লাগলো। দোকানদার ছুটে এসে তাকে ধরে ফেললো। লোকটি কাবুলী ভাষায় বলতে লাগলো, "নিজেও খাও না আবার অন্যকেও মিষ্টি খেতে দাও না, এ কেমন মানুষ তুমি ?"

কিন্তু দোকানদার তার ভাষা বোঝে না। সে হৈ চৈ করতে লাগলো। ছেলের দল জমা হয়ে পড়লো। সবাই তাকে নিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে দিল।

পুশিল দেখলো, লোকটি একজন বিদেশী। এদেশের ভাষা এবং হাব-ভাব সে কিছুই বোঝে না। সুতরাং এই ছোট একটি ব্যাপারে তাকে হাজতে চালান দেওয়া ঠিক হবে না। বরং লোকটিকে মাথা ন্যাড়া করে একটি গাধার পীঠে বসিয়ে সারা শহর ঘোরাতে হবে। ছেলের দল পিছনে পিছনে ঢোলক বাজিয়ে মিষ্টি চোর বলে প্রচার করতে থাকবে।

সুতরাং বিপুল আয়োজনে ছেলের দল এইরূপই করলো।

লোকটি যখন দেশে ফিরে গেল তখন সবাই আসলো তাকে দেখতে, 'বল ভাই, বাংলাদেশ কেমন দেখলা ?"

বললো, "বাংলাদেশ খুব ভাল দেশ। সেখানে বিনা পয়সায় মিষ্টি, বিনা পয়সায় চুল কাটা, বিনা পয়সায় গাধার পীঠে ভ্রমণ, বিনা পয়সায় ছেলেদের বাহিনী আর বিনা পয়সায় ঢোলের বাজনা বাজিয়ে সম্বর্ধনা। সুন্দর এই বাংলাদেশ।

সুতরাং গ্রেফতার হওয়ার পরও যাদের লজ্জা হয় না তাদের আসলে জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ভেবেও দেখে না তাদের পরিণাম কি হবে। দেশের চিন্তা করার আগে নিজের ঈমান রক্ষার চিন্তা করতে হবে।

—আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ; খন্ড-২ , পৃষ্ঠা ২৮৬।

নাস্তিকের দাঁত

এক ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুর রহীম। লোকটি ছিল নাস্তিক। একদিন সে মওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ) এর সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে গেল।

লোকটি বললো ঃ দাড়ি রাখা জরুরী নয়। এটা মানুষের জন্মগত স্বভাব হতে

পারে না। কারণ মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তার দাড়ি থাকে না। অতএব এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ।

মওলানা বললেনঃ মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তার দাঁতও থাকে না। দাঁত গজানোর পরে কি দাঁতগুলিও ভেঙ্গে ফেলতে হবে ?

—আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ; খন্ড ২ , পৃষ্ঠা ২৮৬ ।

নিয়ত খারাব

অমুসলিমদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন না। তাতে অমুসলিমদের অন্তর থেকে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়।

যেমন বৃটিশ আমলে কান্ধালায় এক উকিল সাহেব ছিলেন। তার খুব রসবোধ ছিল। তিনি একবার ট্রেনে সফর করছিলেন। তার কম্পার্টমেন্টে অনেকগুলি হিন্দুও ছিল।

হিন্দুদের মধ্যে এক ব্যক্তি উকিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো, "বল দেখি এদেশের ক্ষমতা যদি তোমাদের হাতে আসে তা'হলে তোমরা হিন্দুদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে ?"

উকিল সাহেব বললেন, "কী আর করবো ? শরীয়তের যা' হুকুম আছে তাই করবো! প্রথমে তাদেরকে মুসলমান হওয়ার জন্যে দাওয়াত দিব। যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে 'জিযিয়া' (কর) প্রদানের আহ্বান জানাবো। যদি তাতেও অস্বীকার করে তখন যুদ্ধের আহ্বান জানাবো।"

হিন্দুগণ চুপ হয়ে গেল। তাদের বলার আর কিছুই রইল না। বস্তুতঃ এই জওয়াবই যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু উকিল সাহেব এবার একটি ভুল করলেন। তিনি কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আর যদি ক্ষমতা তোমাদের হাতে এসে যায় তাহলে তোমরা মুসলমানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে ?"

বললো, "তাহলে মুসলমানদেরকে এত জুতা পেটা করবো যে ওদের মাথার একটি চুলও থাকবে না। সব ঝরিয়ে দেব।"

উকিল সাহেব ছিলেন রসিক বটে। তিনি এবার দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্! তোমার দয়ার সীমা নাই। এই দয়ার জন্যে লাখ লাখ শুকুর।"

ওরা বললো, "কিসের জন্যে শুকুর আদায় করছো ? জুতা খাওয়ার শুকুর নাকি ?"

উকিল সাহেব বললেন, "না, তা' নয়। এই জন্যে শুকুর আদায় করছি যে ইনশা-আল্লাহ্ তোমরা কখনও দেশের ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। কারণ তোমাদের নিয়ত খারাব। যাদের নিয়ত আগে থেকেই খারাব থাকে তারা কোন দিন রাজত্ব করতে পারে না। এরূপ কোন ইতিহাস নাই যে যাদের আগে থেকে জুলুম করার ইচ্ছা ছিল তারা রাজত্ব লাভ করেছে।

--আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৪।

ধনী কৃপণের কান্ড

সংসারে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কিছুটা 'কৃপণ' হওয়া অত্যন্ত জরুরী। যা আমদানী হয় সবকিছু খরচ করে ফেলার অভ্যাস রয়েছে অনেক মুসলমানের।

মাড়োয়ারী মহাজনদের খরচ করার একটি নির্দিষ্ট নীতি আছে। এই নীতিটি বড় কঠোর।

এইরূপ এক বিত্তবান মহাজন ছিল। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ কোন চিকিৎসা করালো না। লোকজন এসে চিকিৎসার জন্যে অনেক অনুরোধ করলো কিন্তু রাজি হলো না। অবশেষে রোগ যখন বেড়ে উঠলো তখন মরে যাওয়ার ভয়ে আত্মীয়-স্বজন কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

মহাজন অবশেষে চিকিৎসা করাতে কত খরচ হবে জানতে চাইলো।

ডাক্তারের ফি, ওষুধ-পত্র ইত্যাদি বাবৎ চিকিৎসার আনুমানিক খরচ তাকে জানানো হলো।

এরপর মরতে কত খরচ হবে ?

মৃত দেহ পোড়াতে মাত্র এক মন কাঠ।

মহাজন দেখলো তুলনামূলকভাবে চিকিৎসার চেয়ে মরে যাওয়ার খরচ কিছুটা কম হবে। সুতরাং মরে যাওয়াই ভাল। তাতে খরচ কম হবে।

অতএব এই লোককে মহাজন না বলে মহাজিন (বিরাট এক জিন) বলাই ভাল।

ঘটনাটি সত্য হোক বা মিথ্যা হোক সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। কিন্তু তাদের খরচ করার নীতিটা এই ঘটনার প্রায় কাছাকাছি।

কিন্তু মুসলমানদের অভ্যাসের পরিবর্তন হয় না কেন ? আমদানীর সব কিছু খরচ করে দিয়ে যখন অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন শয়তান তাকে হারাম পথে উস্কিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

অথচ কৃপণ হওয়াতে লজ্জার কিছু নাই। আপনারা যাকে কৃপণ হওয়া বলছেন শরীয়ত সেটাকে আমানতদারী বলে উৎসাহিত করছে।

কারণ শরীয়ত মতে কৃপণ হলো সেই ব্যক্তি যে (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও) যাকাৎ দেয় না, হজ্জ করে না, কোরবানী করে না, ফেতরা দেয় না, বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করে না।

সুতরাং এইসব খরচ করার মনোভাব থাকার পর কোন ব্যক্তি শরীয়ত মতে আর কৃপণ থাকতে পারে না।

এরপর নিজের এবং পরিবারের সদস্য (স্ত্রী ও সন্তান) দের জন্যে সেই পরিমাণ খরচ করতে হবে যে পরিমাণ খরচ না করলে দৈহিকভাবে অতিরিক্ত কষ্ট হবে অথবা বিপদে পড়তে হবে। কোন শখের জিনিষ খরিদ করা হারাম। কারণ তোমার সম্পদ আসলে তোমার নয়। এগুলি তোমার কাছে আল্লাহ পাকের আমানত রয়েছে মাত্র। যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশ রয়েছে শুধু সেখানেই খরচ করতে পার। অন্যথায় দুনিয়াতেও ভোগান্তি এবং পরকালেও রয়েছে আমানত

খেয়ানত করার অপরাধে কঠোর আযাব।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ;খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৯১

ও খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ১০ অবলম্বনে।

জিনের অট্টহাসি

আল্লাহ্ পাকের মহান সত্ত্বা তাঁর সৃষ্টিকে বিনীত অবস্থায় দেখতে পছন্দ করেন। তার নগণ্য মখলূকও তাই। এমনকি কঠিন-হৃদয় জিনও বিনয়ের কাছে দয়া-প্রবণ হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে।

এক মাড়োয়ারী মহাজনের মেয়ের উপর এক জিন আশেক ছিল। বড় বড় কবিরাজ এসে চেষ্টা করলো। কিন্তু জিন্ হটাতে পারলো না।

এই জিন্‌টি ছিল খুব শক্তিশালী আর তার অন্তর ছিল খুব কঠিন। খুব উশৃঙ্খলও ছিল সে। যে-কবিরাজই তার কাছে যেতো নিরাপদে ফিরতে পারতো না। কারো হাত ভাঙ্গতো, কারো পা ভাঙ্গতো, কাউকে বা হাত-পা বেঁধে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতো। বড় যালেম ছিল এই জিন্‌টি।

মহাজন নিরুপায় হয়ে পড়লো।

একদিন কে একজন মজা করার উদ্দেশ্যে বললো, "অমুক মস্‌জিদে এক মুয়াজ্জেন আছে সে খুব ভাল কবিরাজ।"

মহাজন বেচারা ছুটে গেল মুয়াজ্জেনের কাছে। মুয়াজ্জেন কসম করে বলতে লাগলো সে জিন্ তাড়াতে জানে না। জীবনে কখনও সে এই আমল করেনি। কিন্তু মহাজন তার পায়ে পড়তে লাগলো। হাত জোড় করে নিবেদন করলো। চোখের পানি যখন টস টস করে পড়তে লাগলো তখন মুয়াজ্জেন বললো, "ঠিক আছে চল আমি যাবো। তবে কী দিবে বল।"

মহাজন বললো, "যা' চাও তাই দিব।"

মুয়াজ্জেন বললো, "পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে।"

মহাজন বললো, 'ঠিক আছে তাতেই রাজি।"

মুয়াজ্জেন খুব গরীব ছিল। ভাবলো এই কষ্টের জিন্দেগীর চেয়ে জিনের হাতে মরে যাওয়াই ভাল। আর যদি কোন প্রকারে পাঁচ শ' টাকা পেয়ে যাই তবে সুখের জিন্দেগীতে কাটানোই উচিৎ। বিস্‌মিল্লাহ্ বলে রওয়ানা হয়ে গেল।

মহাজনের বাড়ীতে পৌঁছতেই জিন ওকে দেখে এমন এক অট্ট হাসি দিল যে সেই হাসির আওয়াজে মুয়াজ্জেনের বুক কেঁপে উঠলো। হাসি থামিয়ে ওর দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "আজ তোকে কাঁচা চিবিয়ে খাবো। এসেছিস ভালই হয়েছে। এদিকে আয়!"

মুয়াজ্জেন হাত জোড় করে ওর পায়ে পড়ে গেল, "হুযূর, আমি আপনার রাজ্যের সামান্য একজন প্রজা। আমি কোন কবিরাজও নই বা কোন কবিরাজ গিরিও করতে আসিনি। একজন মূর্খ এবং গরীব মানুষ আমি। এই মহাজনটি গিয়ে আমার ঘাড়ে চেপেছে। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার একটা উপকার হয় আপনার কাছে। যদি পাঁচ মিনিটের জন্যেও এই মেয়েটিকে ছেড়ে যান তবে আমি পাঁচ শ' টাকা পেয়ে যাই। পরে যখন ইচ্ছা আবার চলে আসবেন। আমার উপকার হবে। হুযূরের কোন ক্ষতি হবে না। আমি হুযূর, বড় গরীব মানুষ।

এই কথা শুনে জিন উচ্চ স্বরে হেসে দিল। বললো, "পাঁচ মিনিট নয়। চিরদিনের জন্যে চলে গেলাম। তোর ভাল হউক।"

পাঠক বিশ্বাস করুন, এই মুয়াজ্জেনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে সে জিনের একজন বড় কবিরাজ। সারা জীবনের রুটির ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর পেলো অফুরন্ত শ্রদ্ধা।

কিন্তু এগুলি হলো কিসের বদৌলতে ? শুধু বিনয় আর শ্রদ্ধা দেখানোর বদৌলতে। বিনয় এক আশ্চর্য জিনিষ বটে।

আল্লাহ্‌র নগণ্য মখলুকের কাছে বিনীত হওয়ার কারণেই যদি এত কিছু লাভ হয় তবে যিনি খালেক এবং অফুরন্ত দয়ার মালিক তাঁর কাছে বিনীত হওয়ার লাভ কত হবে ? পাঠক একবার ভেবে দেখুন।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ;খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৪।

রসগোল্লা মাত্র দুইটি

প্রকৃত বিষয় বোঝার আগেই অনেক সময় আলেমদের উক্তিকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। অথচ আলেমগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশটির প্রতিধ্বনি করে থাকেন মাত্র। যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে এরা আল্লাহ্ পাকের বানী বুঝতে অক্ষম।

যেমন এক গ্রাম্য ব্যক্তি জ্বালানি সংগ্রহ করতে এক গাছে উঠলো। সে ডালের আগার দিকে বসে গোড়ার দিকে কোপাতে লাগলো। বোকা লোকটির এই বিপদজনক কাজ দেখে এক মুরুব্বী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "এই তুঁই মরেছিস, তুঁই মরেছিস, মরেছিস!"

এই চিৎকার শুনে লোকটি গাছ থেকে নেমে আসলো। মুরুব্বীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "হুযূর আমি কি সত্যি মরে গেছি?"

মুরুব্বী ভাবলেন, এই লোকটিকে বোঝানো সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি লোকটির কথার কোন জওয়াব না দিয়েই চলে গেলেন।

লোকটি ভাবলো, মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয় না এই জন্যে মুরুব্বী আমার কথার জওয়াব না দিয়েই সরে পড়েছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমি মরে গেছি।

এই ভেবে লোকটি পাড়ার সবাইকে হাত জোড় করে অনুরোধ করে বেড়াতে লাগলো, "আপনারা আমাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমি মারা গেছি।"

কিন্তু তার কথায় কেউ সাড়া দিল না। অগত্যা সে নিজেই একটি কোদাল সংগ্রহ করলো এবং নদীর ধারে গিয়ে কবর খুঁড়তে লাগলো। কবর খোঁড়া শেষ হলে কোদালটি রেখে কবরের ভিতরে মরার মত পড়ে রইল।

ঐ নদী দিয়ে লঞ্চ যাতায়াত করতো। একটি লঞ্চ এসে এক ইংরেজ সাহেবকে নদীর ঘাটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সাহেবটি সরকারী চাকুরী নিয়ে ঐ গ্রামে এসেছিলেন কী একটা কাজের তদারক করতে। তিনি ডাক বাংলায় যাবেন। সঙ্গে রয়েছে বিছানা-পত্র ও একটি বাক্স। কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবে

এগুলি। আশে পাশে কোন লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। অবশেষে দূরে চোখে পড়লো একটি কোদাল। সদ্য মাটি কাটা হয়েছে। কোদালটি এখনও সরানো হয়নি। মাটি-কাটা লোকটি নিশ্চয় আশে পাশে কোথাও আছে।

কোদালটি লক্ষ্য করে সাহেব অগ্রসর হলেন। দেখেন সেখানে একটি গর্ত। গর্তের মধ্যে একটি লোক শুয়ে আছে।

সাহেব তাকে ডাকলেন, "এদিকে এস।"

লোকটি ভাবলো, আমি যে মরে গেছি হয়তো এই ভদ্রলোক জানেন না। তাই আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন। সুতরাং লোকটি কোন সাড়া দিল না। চুপ করে শুয়ে পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগলো।

ভদ্রলোক কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়ে কাছে গিয়ে তার কোমরে এমন জোরে এক লাথি মারলেন যে লোকটি তড়াক্ করে উঠে বসে পড়লো।

লোকটি ভাবলো, কবরে মুনকের-নকীর এসে থাকে শুনেছি। এই লোকটি নিশ্চয় মুনকের-নকীর হবে। এর কথা অমান্য করা যাবে না। যা' বলবে তাই শুনতে হবে।

সুতরাং যখন সাহেব বললো, "আমার সঙ্গে এসো।"

লোকটি ওর সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো।

সাহেব ওর মাথায় বাক্স ও বিছানা-পত্রের পোঁটলাটি চাপালেন এবং একটি মিষ্টির হাঁড়ি ছিল সেটাও হাতে দিয়ে বললেন, "চলো।"

এই বলে সাহেব ওকে নিয়ে ডাক বাংলায় পৌছলেন। ওর মাথা থেকে জিনিষ-পত্র নামিয়ে নিয়ে ওকে আট আনা পয়সা দিলেন। আর মিষ্টির হাঁড়ি থেকে দুইটি রসগোল্লা হাতে দিয়ে বললেন , 'যাও।'

লোকটি খুশীতে গদ্ গদ্ হয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো।

তখন সন্ধ্যা উৎরিয়ে গেছে। রাস্তায় এক ওয়াজ-মহফিলে দেখতে পেলো এক মওলানা সাহেব মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করছেন, "আমাদের সবাইকে মরতে হবে। মুনকীর-নকীরের তিনটি প্রশ্নের জওয়াব সঠিকভাবে না দিতে পারলে

কবরে দোযখের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছু অনন্ত কাল দংশন করে জীবনকে লাঞ্ছনায় ভরে তুলবে।"

লোকটি এই কথা শুনে স্থির থাকতে পারলো না। এক লাফে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো। সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, "ভাইসব এই 'মৌলবী' সাহেবের কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। কবরে এসব কিছুই ঘটে না। আমি এইমাত্র কবর থেকে উঠে আসলাম। কবরে কোন প্রশ্ন করা হয় না। কোনরূপ আগুন জ্বালানো হয় না, কোন সাপ আসে না এবং কোন বিচ্ছুও দংশন করে না। কবরে যা' ঘটে তা' হলো এই যে একজন মুনকের-নকীর বুট জুতা পায়ে এসে এমন জোরে কোমরে এক লাথি মারে যে মৃতব্যক্তি শোয়া থেকে উঠে বসে পড়ে। তারপর তার সাথে কিছু দূর গিয়ে সেখান থেকে বাড়ীতে নিয়ে বোঝা নামানোর পর বিদায় করে দেওয়া হয়। বিদায়ের সময় আট আনা পয়সা দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয় মাত্র দুইটি রসগোল্লা। এর বেশী কবরে আর কিছুই হয় না"।

সুতরাং এই গ্রাম্য লোকটি কবরের বিষয়টি বুঝতে যেরূপ ভুল করেছে সেইরূপ আজকাল অনেক 'বুদ্ধিজীবী' আছেন যারা আলেমদের উক্তিকে হাল্কাভাবে নিয়ে বিচার করে থাকেন। বস্তুতঃ আলেমদের নয়, বরং আল্লাহর বানীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড২, পৃষ্ঠা ১৭৫।

অন্ধ হাফেযের ছাত্রের কান্ড

শুধু কোরআন পাকের তরজমা পাঠ করে সব কিছু বুঝে ফেলেছেন ভাববেন না। তরজমার দ্বারা অনেক সময় উল্টা মানেও বুঝা যেতে পারে। এই জন্য আরবী মূলপাঠ (عبارة) ছাড়া ছাপানো কোরআনের কোন তরজমা পাঠ করা অথবা খরীদ করা সম্পূর্ণ হারাম।

আমাদের জানা মতে এদেশে দুইটি বাংলা কোরআন শরীফ ছাপা হয়েছে। একটি মুসলমানের অনুবাদ এবং অপরটি এক হিন্দুর অনুবাদ। মজার ব্যাপার হলো এরা একজনও আরবী জানতেন না। ইংরেজী থেকে বাংলা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে মূল আরবী থেকে ইংরেজীতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরে ইংরেজী থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে মূল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

আরও মজার ব্যাপার হলো এগুলির একটিতেও আরবী মূলপাঠ নাই। ফলে আরও হাস্যকর হয়ে অনুবাদ তার গতি বদলিয়ে এক 'কিম্ভূতকিমাকার' রূপ ধারণ করেছে। যেন 'বাঁকা দুধ'।

এই বাঁকা দুধের একটি গল্প আছে।

জন্মগত অন্ধ এক হাফেয সাহেবকে তার এক ছাত্র দাওয়াত করেছিল। হাফেয সাহেব বললেন, "দাওয়াতে নিয়ে আমাকে কী খেতে দিবা ?"

ছাত্র বললো, "অনেক কিছু। তবে আপনার জন্যে বিশেষভাবে দুধ রাখা হয়েছে।"

হাফেয সাহেব অন্ধ। তিনি জীবনে কখনও দুধ দেখেননি। তাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই দুধ আবার কেমন জিনিষ ? ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দুধ জিনিষটা কিরূপ ?"

ছাত্র বললো, "দুধ সাদা হয় হুযূর।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় হাফেয সাহেব জীবনে কখনও সাদা জিনিষ দেখেননি। তিনি দুধের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কিরূপ হয় ?"

ছাত্র বললো, "বক যেমন সাদা, দুধও ঠিক তেমনি সাদা।"

হাফেয সাহেব জীবনে কখনও বক দেখেননি। তিনি দুধ খাওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে বকের পরিচয় জানতে জিজ্ঞাসু হলেন, "বক জিনিষটা কেমন ?"

ছাত্র নিজের হাতটি কনুই থেকে এক ভাঙ্গা দিয়ে বকের ধড় এবং কব্জি থেকে আরেক ভাঙ্গা দিয়ে বকের গলা বানিয়ে হাফেয সাহেবের সামনে ধরলো।

হাফেয সাহেব এই কাল্পনিক বকটির গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে চমকিয়ে উঠলেন। এত বড় আঁকাবাঁকা বকের মত শক্ত দুধটি যদি একবার গলায় আটকায় তবে তা বাহির করা সম্ভব হবে না। জেনে শুনে আমি মরণের পথে পা বাড়াতে পারি না। ছাত্রকে বললেন, "আমি তোমার দাওয়াত খেতে যাবো না।"

পাঠক বুঝতেই পারছেন, ছাত্রটি দুধের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দুধকে বক বানিয়ে ছেড়েছে। তরজমার ব্যাপারটিও তেমনি।

তবে আরবী মূলপাঠের পাশাপাশি ছাপানো তরজমা পাঠ করা জায়েয আছে। পঠিত বিষয়টি বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও হক্কানী আলেমের পরামর্শ নিয়ে আমল করতে হবে।

—আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ; খন্ড১, পৃষ্ঠা ৫৭।

আশ্চর্য চিকিৎসা

সন্দেহ করা একটি মারাত্মক রোগ বটে। নামাজে দাঁড়িয়ে সন্দেহ হয়—অজু বোধহয় ভেঙ্গে গেছে, তিন রাকাত পড়লাম না চার রাকাত ইত্যাদি সন্দেহ মানুষকে কাজে অগ্রসর হতে দেয় না।

দেওবন্দ মাদ্রাসার দাওরা ফারেগ এক ছাত্রের একবার সন্দেহ হলো যে তার মাথা নাই। এই কথা সারা মাদ্রাসায় রটে গেল।

ব্যপারটি মাদ্রাসার বিশিষ্ট শিক্ষক হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রঃ)-এর কানে গেল। তিনি ছুটে গেলেন ছাত্রটির কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মাথা নাই?"

আরয করলো, "জী না।"

হযরত জুতা খুলে ছাত্রটির মাথায় মারতে লাগলেন।

ছাত্রটি চিৎকার করতে লাগলো, "হযরত মরে গেলাম, মরে গেলাম--

লাগছে, খুব লাগছে।"

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় লাগছে ?"

বললো, "মাথায় লাগছে।"

হযরত ফরমালেন, "মাথা তো নাই। ব্যথা লাগছে কেমন করে ?"

বললো, "মাথা আছে হযরত, মাথা আছে।"

ফরমালেন, "আর কোন দিন বলবা মাথা নাই ?"

বললো, "না, হযরত না।"

তখন তিনি ছাত্রটিকে ছেড়ে দিলেন।

সুতরাং সন্দেহকে গুরুত্ব দিতে নাই। সবকিছু ঠিক আছে মনে করে কাজ করে যেতে হবে। বাকী আল্লাহ্ মাফ করনেওয়ালা।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ;খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৪।

শেরওয়ানী বিভ্রাট

বুদ্ধি যাদের নাই তাদেরকে শত চেষ্টা করেও বুঝানো যায় না। কী দুনিয়া, কী দীনী সব বিষয়েই তাদের কাছ থেকে হতাশা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

এক ব্যক্তির ছেলের বিয়ে ছিল। বরের জন্যে ছেলের বাপ পাড়া থেকে এক ব্যক্তির শেরওয়ানীটি চেয়ে নিল।

বিয়ে বাড়ীতে বরযাত্রীদের সঙ্গে শেরওয়ানীর মালিকও উপস্থিত হলো।

নিয়ম মাফিক সবাই জামাই দেখতে আসলো। একজন জিজ্ঞাসা করলো, "বর কোনটা ?"

শেরওয়ানীর মালিক বললোঃ "এই যে ইনি হলেন বর। তবে শেরওয়ানীটি আমার।"

ছেলের বাপ লোকটির কাছে এসে বললো, "এই মিয়া, তুমি বড় অনর্থক লোক দেখছি! একথা বলার কী দরকার ছিল যে শেরওয়ানীটি আমার?"

লোকটি বলতে লাগলো, "সত্যি ভুল হয়ে গেছে। এখন থেকে সতর্ক থাকবো।"

এমন সময় আরেকটি লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো, "বর কোন্‌টি?"

শেরওয়ানীর মালিক বললো, "বর এইটি। তবে শেরওয়ানীটি আমার নয়।"

ছেলের বাপ বিরক্ত হয়ে আবার লোকটির কাছে এসে বললো, "তুমি আশ্চর্য লোক দেখছি! একথা বলারই বা কী দরকার ছিল যে শেরওয়ানীটি আমার নয়? শেরওয়ানীর ব্যপারে কোন কথাই উঠবে না।"

লোকটি বললো, "সত্যি একথা বলার কোন দরকার ছিল না এখন থেকে একথাটিও বলবো না।"

এমন সময় আবার একজন এসে জিজ্ঞাসা করলো, "বর কোনটি?"

শেরওয়ানীর মালিক এবার বললো, "বর ইনি। তবে শেরওয়ানীর ব্যাপারে কোন কথা উঠবে না।"

অগত্যা ছেলের বাপ বরের গা থেকে শেরওয়ানীটি খুলে লোকটিকে ফেরত দিয়ে দিল। এ লোকটিকে বুঝানো সম্ভব নয়।

ছোটকাল থেকে যাদের ছহী তরবিয়ত হয়নি তাদের জ্ঞান চিরদিনই অপূর্ণ থেকে যায়। দীনী এন্তেজামের মাধ্যমে গঠিত পরিবারে এরূপ হতে পারে না।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ;খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৮।

খেজুর গাছের ঘটনা

আজকাল রাষ্ট্রীয় নেতাদের কথাকে আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে সমন্বিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাদের কথাকে কোরআনের সাথে সমন্বয় করার

উদাহরণ হলো নীচের ঘটনার মতঃ

এক গ্রামে এক খালাসী বাস করতো। ঘটনাক্রমে সেই গ্রামের এক ব্যক্তি একদিন একটি খেজুর গাছে উঠলো। উঠে গেছে সহজেই কিন্তু আর নামতে পারে না। অনেক চেষ্টা করার পরও যখন আর নামতে পারছে না তখন লোকটিকে বাঁচানোর জন্যে সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। গ্রামের সবাই এসে গাছের নীচে ভীড় করলো। কিন্তু কারো মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না কি করে লোকটিকে নামানো যায়। চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে সেই খালাসীকে ডাকা হলো।

খালাসী এসে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একবার গাছের আগায় তাকায় একবার নীচে তাকায়। ভেবেচিন্তে শেষে বললো--দড়ি আন।

দড়ি আনা হলো।

বললো--দড়ির আগায় গিরা দিয়ে ফাঁস তৈয়ার কর।

তাই করা হলো।

এবার বললো--দড়িটা সজোরে গাছের আগায় নিক্ষেপ কর।

গাছের আগায় লোকটিকে বললো--এই দড়িটা ধরে নিয়ে দড়ির ফাঁস তোমার কোমরে পরে নাও।

তখন গাছের নীচে জমা হওয়া গ্রামবাসী সবাইকে বললো--দড়ির এই প্রান্ত ধরে সজোরে হেঁচকা টান দাও।

সবাই মিলে হেঁচকা টান দেওয়ার সাথে সাথে লোকটি গাছের আগা থেকে নিমিষে নীচে এসে পড়লো। হাড্ডি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ভুঁড়ি বাহির হয়ে দূরে গিয়ে ছিটকিয়ে পড়লো। জীবনটাই শেষ হয়ে গেল।

লোকেরা খালাসীকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা তোমার কেমন পদ্ধতি ছিল ? এ দেখি মারা গেছে!"

খালাসী বললো, "মারা গেছে তা' আমি কী করবো ? আমি শত শত মানুষকে এই পদ্ধতিতে দড়ি বেঁধে কুয়াঁ থেকে তুলেছি কেউ মরেনি। এটা মরে গেল কেন ? ওর তকদীরে ছিল তাই মরেছে।"

সুতরাং এই খালাসী যেভাবে কুয়াঁর সাথে খেজুর গাছকে 'কেয়াস' করেছে

ঠিক তেমনি নেতাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। খাদ্যের অভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ, বিয়েতে বয়সের সীমা নির্ধারণ, ফারায়েযে নিয়মের রদবদল, তালাক ও খোরপোষের মাসআলায় রদবদল ইত্যাদি কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাকার পরিচয়।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৯।

ঘোড়ার গল্প

যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করার মধ্যে কারচুপি করে থাকে তারা দুনিয়াদারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও মালিকের নির্দেশ মানতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ্ এদের বিবেক বিগড়িয়ে দিয়েছেন। শত বার বুঝালেও এদের বিবেক ফিরে আসবে না। তারা হলো সেই লোকটির মত যে এক জমিদারের চাকর ছিল।

চাকরটি সব কাজেই ত্রুটি করতো। বারবার ধমকানোর পরও তার কোন পরিবর্তন হলো না। অবশেষে সে একদিন বললো, "আসলে আমার জানা থাকে না যে আমার দায়িত্বে কি কি কাজ রয়েছে। আমার জন্যে নির্ধারিত কাজের একটা তালিকা লিখে দেওয়া হউক।"

মালিক তাই করলেন। কাজের একটি তালিকা লিখে তাকে দিয়ে বললেন, "এই সকল কাজ তোমার কাছে আমি চাই।"

অন্যান্য কাজের সঙ্গে তালিকার মধ্যে একথাও লিখা ছিল যে যখনই আমি ঘোড়ায় চড়ে সফরে বাহির হবো তখন তোমাকে ঘোড়ার সঙ্গে যেতে হবে।

একদিন মালিক ঘোড়ায় চড়ে সফরে রওয়ানা হলেন। চাকরটিও সঙ্গে সঙ্গে চললো। হঠাৎ মালিকের মূল্যবান চাদরটি পড়ে গেল। চাকর তার কাজের তালিকাটি বাহির করে দেখলো। সেখানে কোথাও একথা লিখা ছিল না যে যদি ঘোড়া থেকে কোন জিনিষ পড়ে যায় তবে তা' উঠিয়ে নিতে হবে। সুতরাং চাদরটি সে উঠালো না।

অতঃপর গন্তব্য স্থলে পৌঁছে মালিক দেখলেন চাদর নাই। চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার চাদর দেখছি না, কি ব্যাপার ?"

বললো, "হুযূর, চাদরটা অমুক জায়গায় ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে।"

মালিক তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চাদর কেন উঠাওনি ?"

লোকটি কাজের তালিকাটি বাহির করে মালিকের সামনে ধরে বললো, "এখানে কোথাও একথা লিখা নাই যে যা-কিছু ঘোড়া থেকে পড়বে তা' কুড়িয়ে নিতে হবে। তাই আমি উঠাইনি।"

মালিক তালিকাটি নিয়ে সেখানে একথাও লিখে দিলেন যে যদি কোন জিনিষ পড়ে যায় তবে তা' উঠিয়ে নিতে হবে।

আরেক দিন মালিক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছেন। চাকরও পিছনে পিছনে চলেছে। সফর শেষ হওয়ার পর চাকর একটা বিরাট পোটলা মালিকের সামনে এনে হাজির করলো।

মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি আছে এর মধ্যে ?"

লোকটি বললো, "আপনার হুকুম মত কাজ করেছি হুযূর।"

মালিক পোটলা খুলে হতবাক হলেন। পোটলা ভর্তি ঘোড়ার লাদি। জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলি কেন ?"

চাকর সেই তালিকাটি মালিকের সামনে খুলে ধরলো। বললো, "দেখুন এর মধ্যে লিখা আছে ঘোড়া থেকে যা-কিছু পড়বে উঠিয়ে নিও।"

অবশেষে লোকটি চাকুরী হারালো। যারা মালিকের ফরমাবরদারী করতে জানে না তাদের এরূপই হয়। আল্লাহর নির্দেশেরও সঠিকটি গ্রহণ করতে হবে। কোনরূপ তাল-বাহানা তিনি বরদাশ্‌ত করেন না।

—আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ ; খন্ড ১ ,পৃষ্ঠা ১৪৭।

পাঠানের রেল সফর

আল্লাহর নির্দেশের পিছনে কোন কারণ খোঁজ করার অর্থ হলো যদি আপনি ডাক ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে ১০ গ্রাম চিঠির ডাক মাশুল কত; তখন যদি আপনাকে ১ টাকা বলে দেয়, এরপর আপনি আবার জিজ্ঞাসা করেন যে ১ টাকা হওয়ার কারণ কি ? তাহলে তার জওয়াবে আপনাকে কী বলা হবে ?

বলবে জনাব, " আমি শুধুমাত্র আইন মোতাবেক কাজ করতে জানি। যদি আপনি ১ টাকার কম টিকিট লাগান তবে আইন অমান্য করার শাস্তি হবে। আপনার চিঠি বেয়ারিং হয়ে যাবে "।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ সবার জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শোনা গেছে কেউ কেউ অযু ফরয হওয়ার পিছনে কারণ খোঁজ করে বলেছেন যে নামাযের জন্যে অযূ এই জন্যে ফরয করা হয়েছিল যে আরবের লোকেরা গ্রাম্য এবং উঁটের রাখাল ছিল। তাদের মুখ মন্ডলে ধূলা এবং হাতে-পায়ে পেশাবের ছিঁটা লাগতো। এই জন্যে তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল যে নামাযের আগে অযূ করে নাও। কিন্তু আমরা শহরে থেকে উন্নত জীবন যাপন করে থাকি। তাপ নিয়ন্ত্রিত কাঁচে ঘেরা বাড়ীতে বাস করি। আমাদের হাত-পায়ে ধূলা লাগতে পারে না। সুতরাং আমাদের অযূ না করলেও চলবে।

এই যুক্তিটি বেশ সুন্দর। সেই পাঠানের যুক্তির মত।

সীমান্তের এক পাঠান রেল গাড়ী থেকে স্টেশনে নেমেছে। তার মাথায় দুই মন ওজনের একটি বোঝা। কিন্তু এই বোঝার লাগেজ বুকিং ছিল না। গেট পার হওয়ার সময় যখন নিজের টিকেট দেখাতে গেল তখন টিকিট কালেক্টর বললেন, "মালের টিকিট কোথায়" ?

সে তখন নিজের টিকিটটি আবার দেখিয়ে দিল।

টিকিট কালেক্টর বললেন,"এটা তো আপনার নিজের টিকিট। মালের টিকিট দিন।"

পাঠান বললো, "না, না। এটা আমারও টিকিট এবং আমার মালেরও টিকিট"।

টিকিট কালেক্টর বললেন, "পনর সেরের বেশী মাল বহন করার জন্যে নিজের টিকিট ছাড়াও অপর একটি টিকিট হতে হবে।"

পাঠান বললো, "আমার জন্যে এই দুই মনই পনর সের। রেল বিভাগ পনর সেরের যে-আইন নির্ধারণ করেছে তার অর্থ হলো--মানুষ যতটুকু বোঝা নিজে বহন করতে পারবে ততটুকু তার জন্যে মাফ করা হবে। বাংলাদেশের মানুষ পনর সের বহন করতে পারে মাত্র। এই জন্যে আইনের বইয়ে পনর সের লিখেছে। আর আমি দুই মন একা বহন করতে পারি। সুতরাং আমার জন্যে এটাই পনর সের।"

তবে কি টিকিট কালেক্টর এই যুক্তি মেনে নিবেন ?

কখনই না। তিনি বলবেন , ''আমার আইনের রহস্য চিরে দেখার দরকার নাই। আইনের বইয়ে পনর সেরের কথাই উল্লেখ আছে। সেখানে পাঠান-কাবুলী ওয়ালা বলে কোন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এই মালের টিকিট হতে হবে।

টিকিট কালেক্টরের এই জওয়াব সমস্ত সভ্য জগৎ মেনে নিবে।

সুতরাং অযূর ব্যাপারেও আমরা একথাই বলবো যে আল্লাহ্ পাক ওযূ ফরয করেছেন এখানে কোন গ্রাম্য বা শহরী ব্যক্তিকে পৃথকভাবে বলা হয়নি। আমরা কোরআনে এই নির্দেশ দেখিয়ে দিতে পারি। এর বেশী আমরা কিছু জানি না। এই নির্দেশের পিছনে কারণ কি তাও আমরা বলতে পারবো না।

—এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ১৯০।

হালাল রুজি খাওয়ার গল্প

হালাল রুজি খাওয়ার ব্যাপারে আজকাল বক্তাগণ একটি গল্প বলে থাকেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তির একেবারে নির্ভেজাল হালাল খাওয়ার খুব সাধ জাগলো। লোকে তাকে পরামর্শ দিল যে এরূপ হালাল খাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে তবে

বসরায় যাও। সেখানে এক ব্যক্তি আছে তার কাছে ছাড়া অধিক হালাল খাদ্য আর কারো কাছে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং লোকটি এই কথা অনুযায়ী বসরায় গিয়ে হাজির হলো। সেখানে সেই বুযুর্গের সাথে দেখা করে বললো, "আমি প্রকৃত হালাল খাওয়ার আশা নিয়ে আপনার খেদমতে এসেছি। আমি শুনেছি আপনার রুজি এত হালাল যে তার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।"

বুযুর্গ এই কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। পরে বললেন, "এতদিন আমার রুজি নিঃসন্দেহে হালাল ছিল। কিন্তু এখন সন্দেহ যুক্ত হয়ে পড়েছে। কারণ আমার হালের গরু এক ব্যক্তির জমিতে ঢুকে পড়েছিল। গরুর পায়ে সেই জমির মাটি লেগে গিয়েছিল। তারপর গরুটি যখন আমার জমিতে হাল চষতে নেওয়া হয় তখন সেই জমির মাটি গরুর পা থেকে আমার জমিতে মিশে গেছে। এখন আমার জমি থেকে উৎপন্ন ফসল হালাল হবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

এই গল্পটি শরীয়তের নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ গরুর পায়ে যতটুকু মাটি লাগতে পারে তা' কোন দাবী করার বস্তু নয়। যার কারণে জমির ফসল হারাম হওয়ার সন্দেহ পয়দা হতে পারে। কোন বুযুর্গ এরূপ করতে পারেন না। এগুলিকে ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বলা হয়।

অথচ বক্তাগণ এইটিকে খুব জোরেশোরে বয়ান করে থাকেন। আর শ্রোতাগণ এই গল্প শুনে 'সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!' করতে থাকে।

কিন্তু এ ধরণের গল্পের ফলে একটা ক্ষতি হয়। সেটা হলো এই যে মানুষ মনে করে হালাল রুজি খাওয়া এক কঠিন ব্যাপার, হালাল খাওয়া আমাদের ভাগ্যে নাই। তাই হালাল খাওয়ার আগ্রহ আর তাদের থাকে না।

সুতরাং শরীয়ত এই ধরণের বাড়াবাড়ি করাকে নিষেধ করেছে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ না করে গা ভাসিয়ে দিবে। বরং বিনা অনুসন্ধানেই যখন জানা হয়ে যায় যে কোন লোকের সম্পূর্ণ আমদানী হারাম, তখন তার বাড়ীর খাবার খেতে হবে না। আর যদি জানা হয়ে যায় যে তার কিছু আমদানী হারাম এবং কিছুটা আমদানী হালাল আছে, তবে সেখানে খাওয়া জায়েয আছে, কিন্তু না খাওয়াই ভাল। আর যদি কারো আমদানী সম্পর্কে

কিছু জানা না থাকে তবে তার সম্পর্কে খারাব ধারণা করার কোন দরকার নাই; হালাল মনে করে খেয়ে নিতে হবে।

কিন্তু আজকাল যারা এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে তাদেরকে সাধারণতঃ মানুষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যেমন এক শাহ্ সাহেবের ঘটনা আছে।

শাহ্ সাহেবের মুরাকাবা

এক শহরে কোথায় থেকে এক শাহ্ সাহেব এসেছিলেন। তার অভ্যাস ছিল, যখনই কেউ তাকে দাওয়াত করতো তিনি মুরাকাবা করতে বসে যেতেন। মুরাকাবা করার পর কাউকে বা বলে দিতেন, "আমি দেখতে পেলাম তোমার বাড়ীতে আমদানী হালাল নয়। কাজেই দাওযাত কবূল করতে পারছি না।" আবার কাউকে বা বলতেন, "দেখতে পেলাম তোমার আমদানীটা বেশ হালাল। সুতরাং তোমার এই দাওয়াত কবূল করলাম।"

ফলে সারা শহরে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো যে তিনি কখনও হারাম রোজগারের খাদ্য গ্রহণ করেন না। মুরাকাবা করে সব জানতে পারেন কার আমদানী কিরূপ। একজন খাঁটি বুযুর্গ এসেছেন বটে এই শহরে!

কিন্তু কিছু লোক ছিল বেশ সতর্ক। তারা ভাবলো, শাহ্ সাহেবের মুরাকাবা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কারণ এটাও তো হতে পারে যে তিনি শুধু মাত্র দাওয়াত প্রদানকারীর প্রকাশ্য হাব-ভাব দেখে অনুমান করে নেন যে এই লোকটি ধনী, সুতরাং ধনী ব্যক্তির আমদানীতে গড় বড় থাকে। আর এই লোকটি গরীব, সুতরাং গরীবের ঘরে খাটুনির আমদানীকে হারাম বলে সন্দেহ করা যায় না। অতএব শাহ্ সাহেবকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

একদিন এই লোকগুলি এক বেশ্যার কাছে গিয়ে বললো, 'তোমার আমদানীর টাকা থেকে কয়েক দিনের জন্যে আমাদেরকে কিছু টাকা দাও দেখি!'

বেশ্যাটি তার সদ্য আমদানী করা কিছু টাকা ওদেরকে দিয়ে দিল।

ওরা সেই টাকা এক গরীব লোককে দিয়ে বললো, "এই টাকায় ভাল করে খাবার আয়োজন করে শাহ্ সাহেবকে দাওয়াত কর।"

গরীব লোকটি পোলাও, কোরমা ইত্যাদি রান্না করে শাহ্ সাহেবের কাছে গিয়ে বললো, "হুযূর, আজ আমার দাওয়াত কবূল করুন।"

শাহ্ সাহেব তার অভ্যাস মোতাবেক মুরাকাবা করতে বসে গেলেন। মুরাকাবা শেষ হলে মাথা তুলে বললেন, "সুবহানাল্লাহ্! তোমার রোজগারে বড় 'নূর' দেখা যাচ্ছে! নিঃসন্দেহে এটা হালাল! তোমার দাওয়াত কবূল করলাম।"

লোকগুলি বুঝতে পারলো শাহ্ সাহেবের মুরাকাবাটি কৃত্রিম মাত্র। সুতরাং প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতঃপর যখন তিনি সেই বাড়ীতে গিয়ে দাওয়াত খেয়ে সারলেন তখন লোকগুলি বললো, "শাহ্ সাহেব, আবার একটু মুরাকাবা করে দেখুন তো, যে-খাবারগুলি খেলেন তা' হালাল ছিল না হারাম ছিল?"

তিনি আবার মুরাকাবা করলেন। মুরাকাবা থেকে মাথা তুলে এবার বললেন, "মাশা-আল্লাহ্! এই খাবার একেবারে নূরে ভর্তি! এগুলি খেয়ে আমার দেমাগ তাজা হয়ে গেছে, চারিদিকে শুধু নূর আর নূর"।

লোকগুলি আর বসে থাকতে পারলো না। জুতা খুলে শুরু করে দিল শাহ্ সাহেবের মেরামত। বেটা মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ--তোর মুরাকাবার ধরণ জানা হয়ে গেছে। তুঁই আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ধোকা দিয়ে বেড়াস? কত ধনী লোকের মনে কষ্ট দিয়েছিস? কত মানুষকে পেরেশান করেছিস? যে খাবারগুলি খেয়েছিস সেগুলি ছিল বেশ্যার আমদানী আর তুঁই সেগুলিতে নূর দেখতে পাস?"

সত্যি, পরীক্ষাটি খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এরূপ পরীক্ষা কয়জন করতে পারে? অধিকাংশ লোকই এই সকল ধোকাবাজদের ধোকায় পড়ে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ই হারায়।

সুতরাং প্রকৃত পীরের পরিচয় জানতে হলে ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

—এলেম ও আমল পৃষ্ঠা ২৩০-২৩৫।

—আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩।

আমার ছেলে এগারটি

বাহাছ বা বিতর্কের দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষ বিতর্কে পরাজিত হওয়ার পরও সত্যটিকে মেনে নেয় না। ফলে বাহাছের দরুণ ঝগড়া-ফাসাদ আরও বেড়ে যায়।

শিক্ষিত লোকেরাও অনেক সময় তর্কের খাতিরে নিজেদের নবীর প্রশংসা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ কওমের নবীর প্রতি বেয়াদবী করে বসে।

আর জাহেলদের বিতর্কে বেয়াদবীর মাত্রাটি আরও কঠিন। যেমনঃ

পশ্চিমাঞ্চলের এক জায়গায় এক খৃষ্টান বক্তৃতা করছিল যে ঈসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র পুত্র।

ঐখান দিয়ে এক গাড়োয়ান মহিষের গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। খৃষ্টানের এই কথা শুনে গাড়োয়ানটি স্থির থাকতে পারলো না। লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে খৃষ্টানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ আল্লাহ্‌র কি আরো কোন পুত্র আছে নাকি ঐ একটাই ?

খৃষ্টান বললো ঃ আর নাই, ঐ একটাই।

গাড়োয়ান বললো ঃ বাস্ ? এতকালে ব্যাটা তোর আল্লাহ্‌র মাত্র একটা ছেলে হলো ? আমি মাত্র কয়েক বৎসর বিয়ে করেছি আমার ছেলে হয়েছে এগারটা--সামনে আরো হবে। তা' হলে তোর খোদার চেয়ে তো আমিই ভাল হলাম!

এই গোঁয়ারের জওয়াব যদিও যুক্তি-সমৃদ্ধ ছিল যে সত্যিতো, যদি আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া সম্ভব হতো তবে এর কী কারণ যে এতকালে তাঁর মাত্র একটি ছেলে হলো ? অথচ তাঁর সামান্য একটি সৃষ্টিজীবেরও অনেকগুলি সন্তান হয়ে থাকে। কিন্তু তার বলার ভঙ্গিটি বড় অশ্লীল।

সুতরাং বিতর্ক পরিত্যাগ করাই ভাল।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ২৭২।

শয়তানের টাকা

দুনিয়ার জীবনটা একটা স্বপ্নের মত। সারাটা জীবন যদি সুখেও কেটে যায় আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি শাস্তির জন্যে পাকড়াও করা হয় তবে দুনিয়ার এই সুখ-শান্তি স্বপ্নের মত মনে হবে।

দুনিয়ার জীবনের সাথে নীচের ঘটনাটির বড় মিল রয়েছে ঃ

এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রত্যেক রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় পেশাব করে দিত। তার স্ত্রী বেচারীকে প্রতিদিন সেগুলি ধুতে হতো। একদিন তার স্ত্রী বললো, "আমি প্রতিদিন পেশাব ধুতে ধুতে হয়রান হয়ে পড়েছি। আর পারি না! আপনার ঘাড়ে কি কোন ভূত চাপে নাকি রাত্রে ?"

লোকটি বললো, "রাত্রের বেলায় স্বপ্নের মধ্যে একটা শয়তান আসে। এসে বলে, 'চল তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' আমি যখন বেড়াতে যেতে উদ্যত হই তখন বলে, 'পেশাব করে নাও! আগে পেশাবের কাজ সেরে পরে চল।' আমি তখন পেশাবখানাতেই পেশাব করছি ভেবে পেশাব করি। পরে দেখি সেটা শোয়ার বিছানা।"

স্ত্রী বললো, "শয়তান তো জিনদের বাদশাহ্। আমরা গরীব মানুষ। তুমি শয়তানকে বল আমাদেরকে কিছু টাকা এনে দিবে। আমাদের এই দুঃখের জীবন শিঘ্রি কেটে উঠবে।"

স্বামী শয়তানকে বলতে রাজি হলো।

রাত্রে যখন ঘুমালো তখন আবার স্বপ্নে শয়তান আসলো।

শয়তান বললো, "চল বেড়িয়ে আসি।"

লোকটি বললো, "রোজ রোজ খালি হাতে বেড়াতে পারবো না। কোথাও থেকে কিছু টাকা এনে দাও তবে যাই"।

শয়তান বললো, "এটা আবার এমন কী কঠিন কাজ। টাকা নিতে হলে আমার সঙ্গে চল, যত ইচ্ছা নিয়ে নিও।"

এই বলে সে লোকটিকে এক বাদশাহ্‌র ধন ভান্ডারের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। দেখে-শুনে টাকার একটা বিরাট বোচকা ওর মাথায় চাপিয়ে দিল। বোচকাটি এত ভারী ছিল যে তার চাপে লোকটার পায়খানা বাহির হয়ে পড়লো।

যখন সকাল হলো, দেখে বিছানায় পায়খানার স্তুপ।

স্ত্রী বললো, "এটা কেমন করে হলো?"

বললো, "রাত্রে শয়তান আমার মাথায় টাকার তোড়া এত বেশী চাপিয়েছিল যে বোঝার ভারী সহ্য করতে না পেরে ত্রুটিপূর্ণ পায়খানা হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বললো, "আগে পেশাব করতেন জনাব সেই ভাল ছিল। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আর পায়খানা করবেন না। আমাদের টাকা-পয়সার দরকার নাই।"

ঘটনাটি অশ্লীল বটে; কিন্তু যদি চিন্তা করা যায় তবে আমাদের জীবনের সাথে লোকটির স্বপ্নের বড় মিল রয়েছে। জীবনটা যেন ঘুমন্ত অবস্থা। মৃত্যু এসে চোখ খুলে দিবে। আমরা তখন বাস্তব জীবনে ফিরে যাবো। নাপাক গুনাহ্ তখন আমাদের সারা অঙ্গে মাখানো থাকবে।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ৫৬৯।

দুই অলস ও একটি কুকুর

'আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাই সাংসারিক কাজগুলি করছি' এই মনে করে প্রতি কাজের প্রারম্ভে সেই কাজের দোয়াটি পড়ে নিলেই আমরা সারাটা দিন 'যাকের' হিসাবে অতিবাহিত করতে পারি। এভাবে আল্লাহ্-ওয়ালা হওয়া খুব সহজ হয়ে যায়। স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার, আরাম-আয়েশ কিছুই ছাড়তে হয় না।

কিন্তু অলসতা মানুষের সহজ কাজগুলিকে যে কত কঠিন করে দেয় তা' নীচের ঘটনা থেকে বুঝা যাবে।

বাদশাহ্‌র বিপদের আশংকা দেখা দিলেই শুধু দেহরক্ষীর প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ আশংকা প্রায়ই হয় না। তবু এক বাদশাহ্ দুইজন দেহরক্ষী নিয়োগ করে রেখেছিলেন। এরা নিশ্চিন্তে বসে বসে শুধু বেতন খেতো। ফলে দেহ মোটা এবং অলস হয়ে পড়েছিল। ঘর থেকে বাহির হবে দূরের কথা অলসতার কারণে সামান্য নড়া-চড়াও করতো না। দুই চোখ বন্ধ করে শুধু চিৎ হয়ে পড়ে থাকতো। খাবারও এদেরকে মুখে তুলে দিতে হতো। ফলে শাহী-মহলের লোকেরা এদের উপরে খুব বিরক্ত হয়ে পড়লো।

একদিন সবাই মিলে এদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল যেন এরা ঘর ছেড়ে পালায়। কিন্তু পালালো না। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তখন চোখ পর্যন্ত খুলে দেখলো না। পুড়ে মরবে ভেবে লোকজন আবার এই মোটা-দুইটিকে অতি কষ্টে টেনে-হেঁচড়িয়ে ঘরের বহিরে এনে রাখলো। আর সম্ভব নয় এদের খেদমত করা--দূরে এক জঙ্গলে নিয়ে রেখে আসলো।

এই বিরাট জঙ্গলে দেখা-শুনা করার মত আর কেউ থাকলো না। স্থির হলো--একজন শুয়ে থাকবে দ্বিতীয়জন তাকে পাহারা দিবে। পরের দিন দ্বিতীয়জন শুবে প্রথমজন তার খেদমত করবে। এইভাবে পালাক্রমে দেখা-শুনার কাজ চলতে লাগলো।

একদিন এক যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে এদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যে-লোকটি শুয়ে ছিল সে তাকে ডাকলো, "এই ভাই যোদ্ধা একটু এদিকে এসো তো!"

সিপাহী কাছে গিয়ে বললো, "কী হয়েছে?"

বললো, "আমার বুকের উপরে যে বরইটি রয়েছে একটু আমার মুখে তুলে দাও তো!"

সিপাহী বললো, "বেটা কমবখ্‌ত! আমি ঘোড়া থেকে নেমে তোর

মুখে বরই দিতে যাবো ? তুঁই নিজ হাতে মুখে গুঁজে নিতে পারছিস্ না ?”

বললো, “এখন কে যাবে জনাব হাত নেড়ে বরই ধরতে !”

পাশে বসে থাকা অলসটিকে সিপাহী বললো, “তুঁই ওর মুখে এই বরইটা তুলে দে।”

সে ঝটকা মেরে বললো, “এমন কথা বলবেন না জনাব! আপনি ভিতরকার ব্যাপার জানেন না। গতকাল আমার শুয়ে থাকার পালা ছিল আর সে তখন বসে ছিল। আমি হাই তুলেছিলাম। আমার হা করা মুখে একটা কুকুর এসে পেশাব করে গেল অথচ এই হতভাগাটা কুকুরটাকে তাড়ালো না পর্যন্ত! আর আজ আমি তার মুখে বরই তুলে দিব ?”

এই ঘটনাটি দেখুন। কত সহজ কাজটিকে অলসতার কারণে কঠিন করে রেখেছে এরা। আর আমরা যে কত সহজে আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে যেতে পারি তা' একবার ভেবেও দেখি না।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ৬৪১।

মগের মুল্লুকের আসল ঘটনা

'আল্লাহ' শব্দটির সঙ্গে সম্মান সূচক শব্দ যুক্ত না করা জায়েয আছে। কারণ শব্দটি তাঁর একত্ব নির্দেশনা করছে। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দটির যিকির অধিক পরিমাণে করা হয়, অন্য শব্দ যুক্ত করলে যিকির কঠিন হয়ে যায়।

তবে আল্লাহ্র ব্যাপারে তখনই বেয়াদবী হবে যখন কোন জোয়ান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে কেউ বলে, “হায়, হায়, কী অসময়ে লোকটির মৃত্যু হলো, ছোট ছোট বাচ্চা রয়ে গেছে এরা বড়ও হতে পারলো না!”

এই কথার দ্বারা সে স্পষ্টতঃ আল্লাহ্কে দায়ী করে বসেছে যে এই মৃত্যুটি যথাসময়ে না হয়ে অযৌক্তিকভাবে অসময়ে ঘটে গেছে।

তখন কোন 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তি এসে বলে, "ভাই, তকদীরে যা' ছিল তাই হয়েছে। তকদীরের লেখা থেকে বাঁচার কোন পথ নাই। আল্লাহ্ পাক বড় বে-পরোয়া।"

এই লোকটিও মৃত্যুর জন্যে আল্লাহ্র বে-পরোয়া হওয়াকে দায়ী করলো। নাউযুবিল্লাহ্! তবে কি আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনায় কোন শৃঙ্খলা নাই? তাঁর কি মানুষের উপরে রহম নাই? তাঁর রাজত্ব কি মগের মুল্লুকের রাজত্বের ন্যায়? ইনসাফ ও দয়া বলতে কিছু নাই?

মগের মুল্লুকের ঘটনা নামে একটি গল্প সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে।

এক গুরু সফরে বাহির হয়েছিল। সঙ্গে তার চেলা ছিল।

এক দেশের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে সেখানে সব জিনিষের একই দাম। দুধও এক টাকায় ষোল সের। ঘি-ও এক টাকায় ষোল সের। তেলও এক টাকায় ষোল সের।

গুরু তার চেলাকে বললো, "এটাই হলো সেই মগের মুল্লুক যেখানে ইনসাফ ও দয়া বলতে কিছুই নাই। সব জিনিষের একই দাম। তার মানে এখানে ছোটতে বড়তে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং এখানে বাস করা বিপদজনক হবে। চল এখান থেকে শিগগির পালাই।"

চেলা বললো, "না। এখানে ঘি আর দুধ খুব সস্তা। এখানেই থেকে যান। দুধ-ঘি খুব খাওয়া যাবে।"

গুরু বললো, "ঠিক আছে। তবে বিপদ আছে।"

চেলা মজা করে কিছুদিন খুব খেলো। খেয়ে দেয়ে একেবারে মোটা হয়ে পড়লো।

কিছুকাল পরে একদিন রাজ দরবার হয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলো সেখানে একটি মকদ্দমা পেশ করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি ছিল এইরূপঃ

দুই চোর চুরি করতে গিয়ে এক বাড়ীতে সিঁধ কাটলো। একজন

বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন সিঁধের ভিতরে ঢুকলো। সিঁধের উপরের দেওয়াল ধ্বসে পড়লো। ফলে চোরটি মারা গেল। বেঁচে থাকা চোরটি এই বলে বাদী হয়েছে যে ইঁট পড়ে আমার বন্ধু মারা গেছে সুতরাং বাড়ীওয়ালার ফাঁসী চাই।

রাজা বাড়ীওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, "এরকম বাড়ী বানানোর উদ্দেশ্য কী ছিল ? তোমার ফাঁসীর হুকুম হলো। কোন কথা থাকলে বল।"

বাড়ীওয়ালা বললো, "হুজুর আমি নির্দোষ। কাজটি ছিল রাজমিস্ত্রীর। আমি এ কাজ করিনি।"

রাজা জল্লাদকে বললো, "একে ছেড়ে দাও। রাজ মিস্ত্রিকে ডাকো।"

সুতরাং রাজমিস্ত্রীকে ডাকা হলো।

রাজমিস্ত্রী বললো, "যোগানদার বালি মাখাতো। সে পাতলা 'গারা' এনেছিল যার দরুণ গাঁথুনি মজবুত হয়নি। আমি নির্দোষ।"

রাজা জল্লাদকে বললো, "একে খালাস দাও। যোগানদারকে ফাঁসী দাও।"

অতঃপর যোগানদারকে ফাঁসির মঞ্চে ডেকে জেরা করা হলো।

যোগানদার বললো, "এটা পানিওয়ালার কাজ। সে পানি বেশী ঢেলে ফেলেছিল যার দরুণ 'গারা' পাতলা হয়ে গেছে। আমার কোন দোষ নাই।"

রাজা বললো, "জল্লাদ! একে ছেড়ে দাও। পানিওয়ালাকে ডাক।

পানিওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো।

সে বললো, "আমার দোষ নাই। সে-সময় একটা হাতী ক্ষেপে গিয়েছিল; হাতীটি ছুটে আমার দিকে আসছিলো। আমি ভয়ে থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তাই পানি বেশী পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং হাতীর দোষ।"

রাজা বললো, "একে খালাস দাও। হাতীর মাহুতকে ডাকো।"

হাতীর মাহুতকে ডাকা হলো।

মাহুত বললো, "দোষ আমার নয়। একটি মেয়েলোকের দোষ। মেয়েলোকটি হাতীর পিছনে পিছনে আসছিল। তার চুড়ির আঘাত কাঁখের কলসে লেগে এমন এক আওয়াজ সৃষ্টি করেছিল যার দরুণ আমার হাতী ক্ষেপে গিয়েছিল"।

রাজা বললো, "এই মাহুতকে ছেড়ে দাও! মেয়েলোকটিকে ফাঁসি দাও।"

সুতরাং সেই মেয়েলোকটিকে ফাঁসির মঞ্চে ডাকা হলো।

মেয়েলোকটি বললো, "আমার দোষ নয়। দোষ স্বর্ণকারের। সে-ই আমাকে চুড়ি বানিয়ে দিয়েছিল।"

রাজা মেয়ে লোকটিকে ছেড়ে দিতে বললো এবং স্বর্ণকারকে হাজির করতে নির্দেশ দিল।

স্বর্ণকারকে ডাকা হলো।

স্বর্ণকার কোন জওয়াব দিতে পারলো না। তার বাপ-দাদা বেঁচে নাই। তাদের কাছ থেকে শেখা কাজ সে করে এসেছে এতকাল। আজ তাদেরকে এই কাঠগড়ায় হাজির করাও যাবে না, জিজ্ঞাসাও করা যাবে না—কেন তারা তাকে একাজ শিখিয়েছে। তাই সে চুপ করে রইল। সুতরাং বেচারার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

তাকে ফাঁসির মঞ্চে নেওয়া হলো। জল্লাদ আসলো। ফাঁসি দিতে গিয়ে দেখে তার গলার চেয়ে দড়ির ফাঁস বড়।

রাজাকে জানানো হলো।

রাজা বললো, "ঠিক আছে, স্বর্ণকারকে ছেড়ে দাও। যার গলা মোটা তাকে ফাঁসি দিয়ে দাও।"

রাজদরবারে যত মানুষ ছিল তাদের মধ্যে সেই চেলাটিই ছিল সব চেয়ে মোটা। তাকেই ফাঁসির মঞ্চে আনা হলো।

চেলা বড় বিপদে পড়ে গেল। সে গুরুকে ধরে বললো, "গুরু আমাকে

রক্ষা করুন।"

গুরু বললো, "ব্যাটা আমি তোকে আগেই বলেছিলাম এদেশে থাকা খুব বিপদ হবে। এখন দুধ-ঘি খাওয়ার মজা দেখ।"

চেলা বললো, "আমি তৌবা করলাম, গুরু এবার আমাকে বাঁচিয়ে নিন। আর জীবনে কোন দিন আপনার কথার বিরুদ্ধে যাবো না। যা' বলবেন তাই শুনবো।"

গুরু এইবার জল্লাদকে বললো, "ওকে ছেড়ে দাও। আমাকে ফাঁসি দাও।"

এই দেখে চেলা ভাবলো, আমাকে বাঁচানোর জন্যে গুরু ফাঁসিতে চড়বেন ? এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকবো আর গুরুর ফাঁসি হবে ? তা' আমি বেঁচে থাকতে হতে দিব না।

সে জল্লাদকে বললো, "কখনও না। ফাঁসি আমাকে দাও।"

গুরু বললো, "না। ফাঁসি আমাকে দিতে হবে"।

এই নিয়ে দুইজনে তুমুল ঝগড়া। এ বলে আমাকে দাও, ও বলে আমাকে দাও ফাঁসি। এখন কাকে দিবে ফাঁসি ?

জল্লাদ ব্যাপারটি রাজাকে জানালো।

রাজা গুরুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, "কি হয়েছে তোমার ? তুমি কেন ফাঁসিতে যেতে চাও ?"

গুরু বললো, "হুযূর, আমি জানতে পেরেছি, এখন এমন একটি লগ্ন যখন কেউ ফাঁসি লাভ করবে সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ স্বর্গে চলে যাবে। এই জন্যে আমি চাই ফাঁসিটা আমাকেই দেওয়া হউক।"

রাজা বললো, "তাই যদি হয় তবে বৈকুণ্ঠে আমি যাবো সবার আগে। ফাঁসি আমাকে দাও।"

রাজার আগে বৈকুণ্ঠ যেতে কেউ সাহস করলো না। সুতরাং আর কোন ঝগড়া হলো না।

রাজার ফাঁসি হয়ে গেল। দেশ ঠান্ডা হলো।

গুরু চেলাকে বললো, "আর এক মুহূর্ত এদেশে নয়। চল এদেশ থেকে কেটে পড়ি। এদেশ নিরাপদ নয়।"

এটাকে যদিও একটি খামখেয়ালী গল্প বলে মনে হচ্ছে কিন্তু বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায় অত্যাচারের একটি সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে এখানে।

মানুষ আজকাল আল্লাহ্‌কে প্রায় যেন সেই রকমই ভেবে রেখেছে। তাই আল্লাহ্ সম্পর্কে 'বেপরোয়া' শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ্‌কে বলতে চায় তিনি সামঞ্জস্যহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু করে থাকেন। যে-সকল ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাতে কুফুরীতে পতিত হতে হয়। কিন্তু একমাত্র দেওবন্দী ওলামাদের উদারতা যে তারা এদেরকে কুফুরীর ফতোয়া দেন না। কারণ শব্দটির এইরূপ ব্যবহারের সময় তাদের কুফুরী করার নিয়ত থাকে না। আর এটা জানেও না কিসে কুফুরী হয়।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ৬২৫।

প্রকৃত বোকা

আজকাল মানুষকে যখন কেউ প্রশংসা করে তখন তাকে সে নির্ভরযোগ্য হিসাবে ধরে নিয়ে সত্যি সত্যি নিজেকে ভাল মনে করে বসে। একবার ভেবেও দেখে না যে সে আল্লাহ্‌র কাছেও ভাল কিনা।

এক নাপিতনী তার প্রতিবেশী এক মেয়েলোককে নাকের নথ্ খুলে মুখ ধুতে দেখেছিল। নথ্ খুলতে দেখে ভাবলো মেয়েটি বিধবা হয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে তার নাপিতকে বললো, "বসে দেখছো কী ? শিগগির গিয়ে মেয়েটির স্বামীকে খবর দাও-- তার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে।"

নাপিত তাড়াতাড়ি উঠি-পড়ি করে মেয়েটির স্বামীর কাছে গিয়ে বলতে লাগলো, "হুযূর, বরবাদ হয়ে গেছে! আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে।"

এই খবর শোনা মাত্র লোকটি ডুকরিয়ে কাঁদতে লাগলো, "হায় আমার কি হবে ?"

বন্ধুরা সব ছুটে আসলো। জিজ্ঞাসা করলো, "কাঁদছো কেন ? খুলে বল কী হয়েছে ?"

বললো, "সর্বনাশ হয়েছে। আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে।"

বন্ধু বললো, "জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমার ? তুমি সশরীরে জীবন্ত বসে আছ আর তোমার স্ত্রী বিধবা হয়েছে ?"

লোকটি বললো, "হাঁ, তা তো ঠিকই। জীবিতই তো আছি। কিন্তু খবর যে নির্ভরযোগ্য লোক দিয়েছে! না কেঁদে পারি না।"

সেইরূপ আজকাল মানুষ নিজের প্রশংসাকারীকে নির্ভরযোগ্য মনে করে আত্মভোলা হয়ে পড়ে এবং গুনাহ্গার হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নেককার ভেবে থাকে।

আল্লাহ্ তাকে ভাল বললো কিনা সেদিকে লক্ষ্য নাই। এরা হলো প্রকৃত বোকা।

বিয়ের সাজে সজ্জিত বধূর উক্তি

এ প্রসঙ্গে মুযাফ্ফর নগরের একটি ঘটনা আছে। সেখানে এক বিয়েতে কনেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তার বান্ধবীরা পাল্কীতে তুলে দেওয়ার সময় চিবুক স্পর্শ করে বললো, "সখি আজ তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

কনে বললো, "তোমরা শত শত বান্ধবীও যদি আমাকে সুন্দর বল তবু আমি সুন্দর হতে পারি না সখি, যতক্ষণ না সেই একজন আমাকে সুন্দর বলছে যার জন্যে আমার এত সাজ গোজ"।

সত্যি, কত সত্য কথা! যার জন্যে আমাদের জীবন মরণ সেই আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে ভাল না বলেন তবে লোকে ভাল বললে কী যায় আসে ?

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ২৯২।

মুল্লা মাহ্মুদের জানাযা

অনেক 'মওলানা' আছে যারা একেবারে জাহেল হয়। বরং কথাটি এইভাবে বলা যায় যে অনেক জাহেল আছে যারা মওলানা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে বসে।

অথচ মওলানা শুধু তাকেই বলা যাবে যে আল্লাহ্-ওয়ালা হবে এবং আল্লাহওয়ালা হতে হলে শরীয়তের জ্ঞান থাকতে হবে।

কিন্তু আজকাল যারা দুই চারটি আরবী উর্দু কেতাব পড়েছে তাকেই মওলানা হিসাবে প্রসিদ্ধ করে দেয়। যদিও সেই কেতাবগুলি সাহিত্য অথবা দর্শনের বিষয় হয়।

যদি শুধু দর্শন পাঠ করেই মওলানা হওয়া যেতো তবে এরিষ্টটল বড় মওলানা। অথচ তার একত্ববাদী হওয়ার ব্যপারেও প্রশ্ন আছে। আর যদি আরবী সাহিত্য পাঠ করে মওলানা হওয়া যেতো তবে আবু জেহেল সবচেয়ে বড় মওলানা। কারণ তার আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সুতরাং দর্শন বা আরবী সাহিত্য পড়ে মানুষ মওলানা হতে পারে না।

মুল্লা মাহ্মূদ জৌনপুরী তাঁর যুগে একজন বড় মওলানা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক মাত্র। শরীয়তের এলেম তার ছিল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন খুব। এমন কি দিল্লীর বাদশাহও নিজের দরবারে ডেকে নিয়ে তাকে খুব সম্মান দেখালেন। এক 'মৌলবী' আগে থেকেই সেই দরবারে খুব প্রিয় ছিল। এই লোকটি ভাবলো

মুল্লা মাহ্‌মূদ যদি বাদশাহ্‌র প্রিয় হয়ে যায় তবে আমার কোন মর্যাদা থাকবে না। তাই কিভাবে বাদশাহ্‌র কাছে প্রমাণিত করা যায় যে মুল্লা মাহ্‌মূদ একজন জাহেল সেই চেষ্টায় থাকলো। অল্প বিদ্যার মৌলবীদের যেমন হিংসা রোগ থাকে এই লোকটিরও তেমনি ছিল।

একদিন একটি জানাযা আসলো। সবাই আগ্রহ করে নবাগত 'মওলানা' মুল্লা মাহ্‌মূদকে জানাযায় ইমামতি করতে দাঁড় করিয়ে দিল।

মৌলবী সাহেব তার হিংসা চেপে রেখে পিছন থেকে এগিয়ে এসে মুল্লা মাহ্‌মূদের কানে কানে বলে দিল, "জানাযায় লোক অনেক বেশী হয়েছে দূরের লোক যেন শুনতে পায় কেরাত একটু জোরে পড়বেন।"

মুল্লা মাহ্‌মূদ আল্লাহ্‌ আকবর বলে জানাযার নিয়ত বেঁধে জোরে জোরে সূরা কেরাত ইত্যাদি পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। পিছনের লোকজন নামায ছেড়ে দিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল, "কে এইটা, জানাযার নামাযও পড়তে জানে না ? জানাযার নামাযে সূরা কেরাত পড়তে শুরু করে দিয়েছে" ? ইত্যাদি।

অবশেষে তাকে ইমামতি থেকে পিছনে আনা হলো এবং তার জাহালতির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

মোটকথা অনেক জাহেল আছে তারা আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে দেশের বাদশাহ্‌র কাছেও মর্যাদা পেতে পারে।

নূন্যতম আলেমের পরিচয় ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ২০২।

বিয়ে বড় মজার জিনিষ

শরীয়তের বিধানগুলি এত সহজ এবং পরিচ্ছন্ন যে ওহী নাযেল না-ও যদি হতো তবু একজন স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী এই বিধানগুলি চিনে নিতে

পারতো যে এগুলিই আল্লাহ্‌র বিধান। যারা এই বিধানগুলি চিনতে পারে না তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

এক হাফেয তার ছাত্রদেরকে খুব মার–ধর করতেন। ছাত্ররা ভাবলো এই হাফেয সাহেবের বিয়ে করিয়ে দেওয়াই উচিৎ। সবাই এক জোট হয়ে হাফেয সাহেবের সামনে বলাবলি করতে লাগলো, "বিয়ে বড় মজার জিনিষ।"

"বিয়ে বড় মজার জিনিষ" কথাটি যেন হাফেয সাহেবের একেবারে অন্তরে গেঁথে গেল। তিনি সব সময় ভাবতে লাগলেন– 'বিয়ে বড় মজার জিনিষ।'

একদিন বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ছাত্রদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোরা যে বলিস্ 'বিয়ে বড় মজা'– সত্যি কি তাই ?"

ছাত্ররা সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো, "হাঁ হুযূর, বিয়ে বড় মজার জিনিষ।"

হাফেয সাহেব অনেক চেষ্টা করে একটা মেয়ে বিয়ে করে আনলেন।

রাত্রে যখন মেয়েটি ঘরে আসলো তখন তিনি মেয়ের গায়ে রুটি ভরিয়ে ভরিয়ে খেলেন। কিন্তু কোন মজা পেলেন না।

পরদিন সকালে ছাত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, "তোরা বললি, 'বিয়ে খুব মজার জিনিষ'– আমি রুটি ভরিয়ে খেয়ে দেখলাম। কোন মজা পেলাম না।"

ছাত্ররা বললো, "মারতে হয় জনাব, মারতে হয়। মারলে মজা পাওয়া যায়।"

পরদিন রাত্রে হাফেয সাহেব বেচারী মেয়েটিকে খুব মারলেন। এত মারলেন যে পাড়ায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। লোকজন ছুটে এসে হাফেয সাহেবকে খুব গালাগালি করলো। হাফেয সাহেব বিপদে পড়লেন। মজা কিছুই পেলেন না। শুধু গালাগালির চোটে অপমানে তার গা কাঁপতে লাগলো। অতঃপর সব আশা ছেড়ে দিয়ে নিরিবিলি মুখ ভার করে বসে

ভাবতে লাগলেন।

এক ব্যক্তির দয়া হলো। সে তাকে সাহায্য করলো। হাফেয সাহেবের কাছে গিয়ে তার কানে কানে বিবাহের হাকীকত বুঝিয়ে দিল।

পরের রাত্রে হাফেয সাহেব আবার বউয়ের কাছে গেলেন। আজ তিনি বিবাহের হাকীকত অনুযায়ী আমল করলেন। দেখলেন সত্যি মজা! সারা দেহে যেন তার আনন্দের ঢেউ খেলে গেছে।

কারণ এবার তিনি মনুষ্য প্রকৃতি অনুযায়ী আমল করেছেন।

এই প্রাকৃতিক বিধান দেখানোর জন্যেই ওহী এসে মানুষকে সাহায্য করেছে। কারণ সব মানুষের অন্তর এত স্বচ্ছ নয় যে সে নিজের সঠিক প্রকৃতিটি বুঝে নিতে পারবে।

মানুষ তার জীবনের প্রতিটি কাজে এই ওহীর অনুসরণ করে এক বেহেশতী স্বাদ ভোগ করতে পারে। যা' রসূলের সুন্নত পালনের মাধ্যমে সম্ভব।

--আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্; খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৩।

হাতীর ঘটনা

ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো ঠিক অন্ধ ব্যক্তির মতন।

অন্ধ লোকদের শহরে একবার এক হাতী এসে পড়েছিল। হাতী দেখতে অন্ধের দল সব হাজির হলো। কিন্তু চোখ নাই হাতী দেখবে কি দিয়ে?

অগত্যা সবাই হাত দিয়ে হাতড়িয়ে হাতী দেখতে লেগে গেল। কারো হাত লেজে, কারো হাত কানে, কারো হাত পায়ের উপর পড়লো। আবার

কেউ হাতড়িয়ে শুধু শুঁড় ধরতে পারলো। এভাবে হাতী দেখা সমাপ্ত করে সবাই একটি জায়গায় মিলিত হলো হাতী কেমন ছিল দেখতে বলাবলি করতে লাগলো।

কেউ বললো, "হাতী দেখতে একটা মোটা সাঁপের মত।" এই লোকটির হাত শুঁড়ের উপর পড়েছিল।

আর যার হাত কানের উপর পড়েছিল সে বললো, "কখনও না, তুমি ভুল দেখেছো। হাতী দেখতে ঠিক একটা কুলার মত।"

যার হাত পায়ের উপর পড়েছিল সে বললো, "তোমাদের একজনের কথাও ঠিক নয়। হাতী দেখতে ঠিক যেন একটা মোটা খাম্বা।"

কিন্তু যে লেজ ধরতে পেরেছিল সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেলো, "তোমরা কেউ হাতী দেখতে পাওনি। হাতী আমি দেখেছি। হাতী হলো ঠিক একটা ঝাঁটার মত।"

এই কথা শুনে সবাই রেগে গেল। তুমূল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। এ বলে আমারটা ঠিক, ও বলে আমারটা ঠিক।

কিন্তু কার কথা ঠিক ? যদি চিন্তা করে দেখা যায় তবে সবাই সত্যবাদী। কারণ হাতড়ানোর ফলে ওরা যা' জানতে পেরেছিল তাই বলেছিল। আবার সবাই মিথ্যাবাদী। কারণ হাতীকে নিজের হাতড়িয়ে পাওয়া আকৃতিতে কেন মেনে নিল ? হাতীর একটি অংশকে পূর্ণ হাতী হিসাবে কেন গ্রহণ করলো ? হাতী তো কোন একটা অংশের নাম নয়। যদি সবাই বলতো আমরা একটি মাত্র অংশ দেখেছি তবে সব ঝগড়া মিটে যেতো।

আমরাও ইসলাম সম্পর্কে এই পন্থাই অবলম্বন করেছি। ইসলামের এক একটি অংশ মাত্র গ্রহণ করে নিজেকে দীনদার ভেবে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, গ্রহণ করা একটি অংশের মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করেছি। আমার গৃহীত অংশটি অন্যের মধ্যে যদি না থাকে তবে তাকে বে-দীন বলে গালি দিয়ে থাকি।

কয়েকজন লোক জামার মালিক হতে চেয়ে যদি কেউ জামার হাতা পরে, কেউ গলা পরে, কেউ পীঠের কাপড় আর কেউ শুধু পেটের কাপড় পরে তবে এই খন্ড খন্ড করে গায়ে দিয়ে জামার মালিক হওয়া যাবে না। কারণ জামা বলা হয় এসব কিছুর মিলিত সমষ্টিকে। যে ব্যক্তি এসবের সমষ্টি একত্রে গায়ে দিয়েছে তাকেই বলা যাবে জামার মালিক।

এভাবে ইসলামী তাকেই বলা হবে যার মধ্যে ইসলামের সকল অংশই একত্রে মিলিত হয়েছে।

--এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ৭০৩।

ফাস্ট ক্লাস ও থার্ড ক্লাস

অশিক্ষিত লোকেরাও অনেক সময় যুক্তির বলে শিক্ষিত প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। সত্যের পক্ষে থাকলে এ রকমই হয়। আর মিথ্যার পক্ষ নিলে যত বড় শিক্ষিতই হোক পরাজিত হয়ে যাবে। যেমনঃ

এক বিত্তবান ব্যক্তি ছিল। সে লেখাপড়া কিছুই জানতো না। এমন কি দস্তখতও করতে জানতো না। শুধু একটি সীল বানিয়ে নিয়েছিল দস্তখতের জায়গায় সেই সীলের ছাপ মেরে দিত। এভাবেই তার চলতো।

একদিন সে সফরের উদ্দেশ্যে তার গ্রাম থেকে রেল ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলো। পথে এক পাদরী তার খৃষ্টান ধর্মটি সত্য হওয়ার যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছিল।

পাদরী বলতে লাগলো, "পৃথিবীর পাঁচ শ' কোটী মানুষের মধ্যে খৃষ্টান জন সংখ্যাই বেশী। সুতরাং খৃষ্টানরাই আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হবে। বাকী সবাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

এই কথা শুনে সেই অশিক্ষিত লোকটি তার সওয়ারী থেকে নেমে খৃষ্টানটির কাছে গিয়ে বললো, "আমার সঙ্গে রেল ষ্টেশনে চল। সেখানে

আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিব জনসংখ্যায় বেশী যারা তারাই ভাল না জনসংখ্যায় কম যারা তারা ভাল।"

পাদরী বললো, "কেমন করে বুঝা যাবে?"

লোকটি বললো, "রেলগাড়ীতে ফাষ্টক্লাসে লোক বেশী থাকে না থার্ড ক্লাসে বেশী থাকে?"

পাদরী বললো, "ফাষ্ট ক্লাসে কম আর থার্ড ক্লাসে বেশী লোক থাকে।"

লোকটি বললো, "তেমনি আমরা মুসলমান জনসংখ্যায় কম আমরা হলাম ফাষ্ট ক্লাস। আর তোমরা জনসংখ্যায় বেশী তোমরা হয়েছো থার্ড ক্লাস।"

পাদরী নির্বাক স্তব্ধ। আর কোন জওয়াব দিতে পারে না।

– এলেম ও আমল ,পৃষ্ঠা ২৬৩।

আঙ্গুর খাওয়ার ঘটনা

মানুষকে আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা-শক্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্তে 'ফানা' হয়ে যাওয়ার নামে মানুষ তার ইচ্ছা-শক্তিকে অস্বীকার করে অনেক সময় ভুল করে থাকে। মওলানা রূমী তাঁর মসনবী শরীফে এরূপ ভুলের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

এক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাশক্তির ব্যপারে উদাসীন হয়ে পড়লো। এক বাগানে ঢুকে কাউকে কিছু না বলেই আঙ্গুঁর খেতে লেগে গেল ।

বাগানের মালিক ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "কে তুমি? আমার আঙ্গুঁর খাচ্ছ কেন "?

লোকটি বললো, "আঙ্গুঁর আল্লাহ্র , আমিও আল্লাহ্র । আল্লাহর

আঙ্গুঁর , আল্লাহ্‌র বান্দা খাচ্ছে। এখানে তোমার -আমার বলার কিছু নাই" বলে আবার খেতে লেগে গেল ।

মালিক একটি লাঠি নিয়ে বললো , "এই লাঠি আল্লাহ্‌র, আমিও আল্লাহ্‌র , তোমার মাথাটিও আল্লাহ্‌র । সুতরাং আল্লাহ্‌র লাঠি আল্লাহ্‌র বান্দার মাথায় আঘাত করছে। এখানে তোমার -আমার বলার কিছু নাই।" বলেই লোকটির মাথায় আঘাত করতে লেগে গেল। লোকটি আঘাত পেয়ে যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠলো আঙ্গুঁর খাওয়া ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। বুঝতে পারলো সে একটা বড় ভুল করেছিল।

মানুষ তার ইচ্ছা- শক্তির সঠিক প্রয়োগ না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

— আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ;খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৪।

আগে নামায পরে অযূ

ইসলাম কোন দার্শনিক চিন্তাধারার ফল নয়। এটা আল্লাহ্ পাকের একটি নির্দেশ । দর্শনের উর্দ্ধে এর স্থান। দর্শন যদি এর সাথে সমন্বিত হয় তবে সেটা আকস্মিক ব্যপার ।

সুতরাং এই নির্দেশনা গ্রন্থ কোরআন আগে শিখতে হবে। পরে দর্শন বা তর্কশাস্ত্র পাঠ করলে অধিক সহায়ক হবে। কিন্তু যারা আগে তর্কশাস্ত্র পাঠ করে থাকে তারা কোরআন হাদীসকে তর্ক বিদ্যার নিয়মে বুঝতে চেষ্টা করে। তাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

মওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) এর কাছে এইরূপ এক তর্ক বিদ্যা পড়া ছাত্র হাদীস পড়তে আসলো । যখন এই হাদীসের আলোচনা শুরু হলো

لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -

"আল্লাহ্ পাক কোন নামায অযূ ছাড়া কবূল করেন না"।

তখন ছাত্রটি বললো, "এর দ্বারা তো নামায কবূল না হওয়ার কথা বুঝা যাচ্ছে, কিন্তু নামায যে ছহীও হবে না তা' তো প্রমাণিত হচ্ছে না। সম্ভবতঃ বিনা অযূতে নামায ছহী হবে, পরে যখন অযু করা হবে তখন সেই নামাযটি কবূল হয়ে যাবে।"

এই কথা শুনে ক্লাসের সবাই হেসে দিল। বেচারা যুক্তি বিদ্যা ভাল করেই শিখেছিল। কিন্তু নির্দেশ যে যুক্তির উর্দ্ধে সে কথা বুঝতে পারছে না।

নামায আগে আর অযু পরে হওয়ার ব্যপারটি ঠিক শৌচকার্য আগে সেরে নিয়ে পরে পায়খানা করার ঘটনার অনুরূপ।

অর্থাৎ এক ব্যক্তির ঘটির তলায় সামান্য ছিদ্র ছিল। ঘটি ভরে পানি নিয়ে সে পায়খানায় গেল। কিন্তু পায়খানা করা শেষ হলে যখন পানি খরচ করতে যাবে তখন দেখে ঘটিতে পানি নাই। লোকটি অবাক হলো। পানি তো সে ভরেই এনেছিল। পানি গেল কোথায়? একদিন, দুইদিন, প্রতি দিনই এ রকম হয়। একদিনও সে শুচ্তে পারে না।

অবশেষে একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে খুশী মনে ঘটিতে পানি ভরে পায়খানায় প্রবেশ করলো। পায়খানায় ঢুকেই ঘটি ভরা পানি দিয়ে ভাল করে শুচে নিল। এর পর পায়খানা করতে বসে মনে মনে ভাবলো আজ খুব জব্দ করেছি। এক দিনও শুচ্তে পারিনা। আজ বেশ মজা করেই কাজটি সেরে নিয়েছি। এখন যত ইচ্ছা পায়খানা কর।

পায়খানা সমাধা করে সে শূন্য ঘটি হাতে বাহির হয়ে আসলো। এখন থেকে প্রতিদিনই সে এইরূপ করবে। মনে মনে খুব খুশী।

এ ধরণের দার্শনিক যুক্তি মানুষকে গোমরাহ্ করে দেয়।

— এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ২৭৪।

ঈদের চাঁদ

অপরের সংশোধনের জন্যে আজকাল মানুষ খুব চিন্তিত। কিন্তু নিজের সংশোধনের দিকে মনোযোগ নাই। ফলে অন্যের দোষগুলি শুধু চোখে পড়ে। নিজের দোষ সমূহের কথা ভেবেও দেখে না। এদের উদাহরণ হলো ঠিক সেই মেয়েলোকটির মত যে ঈদের চাঁদ দেখে প্রতি বৎসর আনন্দে মেতে উঠতো।

কিন্তু একবার ঈদের চাঁদ খোঁজার সময় তার ছোট শিশুটি পায়খানা করে দিল। মেয়েলোকটি বাচ্চাকে শূচাতে গেছে এমন সময় পাড়ার মেয়েরা 'ঐ চাঁদ উঠেছে, ঐ চাঁদ উঠেছে' বলে হৈ চৈ শুরু করে দিল।

চাঁদ উঠেছে শুনে মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার বাচ্চাকে এমন ভাবে সূচালো যে হাতটি ভাল করে ধুতে পারলো না। দৌড়ে এসে চাঁদ দেখে খুশীতে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলো। দোয়া শেষে হাত দুইটি মুখে বুলিয়ে নিল। কিন্তু এ কি ? গন্ধ কেন ? ঘৃণায় থু থু করে বল্‌তে লাগলো, "ছি, এবারের ঈদের চাঁদে একেবারে টাটকা পায়খানার গন্ধ! এমন দূর্গন্ধের চাঁদ কোন দিন দেখিনি।"

অথচ গন্ধ ছিল তার হাতে। বাচ্চাকে তাড়াহুড়া করে শুচাতে গিয়ে হাতে পায়খানা লেগে আছে সে দিকে লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য শুধু নির্মল চাঁদের দিকে। যত দোষ এই সুন্দর চাঁদটিকে দেওয়া হলো।

— আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্‌।

ওয়াহাবী ধরা পড়েছে

ওয়াহাবী হওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তি ধরা পড়লো। ওয়াহাবী হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ তাকে বলা হলো; "তোমাকে যখনই দেখ মসজিদ থেকে বাহির হচ্ছো, যখনই দেখ কোরআন পড়ছো, যখনই দেখ নামায পড়ছো তুমি ওয়াহাবী না তো কি ? নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াহাবী। চল থানায় চল"।

আরেক ব্যক্তি তার উপকার করতে এসে বললো, "না জনাব, না। এটা ওয়াহাবী নয়। একে আমি অমুক বেশ্যা পাড়ায় দেখেছি, অমুক জায়গায় কাওয়ালী শুনতে দেখেছি, অমুক কবরে সেজদা করতে দেখেছি সুতরাং এটা ওয়াহাবী হতে পারে না। এটা পাক্কা সুন্নী"।

এবার লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। লোকটি প্রাণে বেঁচে গেল।

তবে আজকাল ওয়াহাবী সম্পর্কে ততটা কড়াকড়ি নাই। ওয়াহাবীর শুধু পরিচয়টা ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ ওয়াহাবী হলো সেই যার পায়ে গিরার উপরে পাজামা থাকবে, হাঁটুর নীচে কোর্তা থাকবে , কপালে সেজদার দাগ থাকবে, নামাজের ফরজগুলি আদায়ের সময় তাড়াতাড়ি করবে না একাগ্রতার সাথে ধীরে ধীরে নামায আদায় করবে সেই হবে একজন ওয়াহাবী।

— আল - এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ ; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৮।

লজ্জাশীলা মহিলার কান্ড

এক ব্যক্তি এক চিঠিতে আমাকে লিখেছেন, মুসলমানদের উপর অযথাই অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে তারা গরু ইত্যাদি জবাই করে নির্দয়

ভাবে পশু হত্যা করছে। কিন্তু যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই জীব হত্যার অপবাদ রটায় তারাই আবার মানুষ হত্যা করে চলেছে।

অর্থাৎ তুচ্ছ গরু জবাইকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মানুষের উপর অহরহ জুলুম অত্যাচার চালায় এমনকি মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

জীবের প্রতি তাদের দয়ার ধরণ হলো এক লজ্জাশীলা মহিলার মত। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে দেখে লোকটি বাড়ীতে নাই। বাড়ীওয়ালা কোথায় গেছে তা জিজ্ঞাসা করার মত কাউকে খুঁজেও পাওয়া গেল না। অগত্যা বাড়ীওয়ালার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার স্বামী কোথায় গেছে "?

কিন্তু ঐ মহিলা এতই লজ্জাশীলা ছিল যে কিছুতেই সে পর পুরুষের সামনে মুখ খুলতে পারলো না। এদিকে প্রশ্নকর্তাকে একটা জওয়াব দেওয়াও জরুরী। তাই অনেক ভেবে চিন্তে সে তার সামনেই ন্যাংটা হয়ে পেশাব করলো এবং প্রবাহিত সেই পেশাবের উপর লাফ মেরে ডিঙ্গিয়ে গেল। এর অর্থ হলো, আমার স্বামী নদীর ওপার গেছেন।

তাদের দয়ার ধরণ হলো এইরূপ। অর্থাৎ গরু হত্যা চলবে না, কিন্তু (সৃষ্টির সেরা জীব) মানুষ হত্যা চলবে।

– আশরাফুল জওয়াব।

গরু হত্যা চলবেনা মানুষ হত্যা চলবে

"গরু হত্য চলবেনা, মানুষ হত্যা চলবে' এই মনোভাবের আরেকটি উদাহরণ হলোঃ

এক ব্যাক্তি এক যুবতীর সাথে অবৈধ ভাবে মেলামেশার ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়লো। ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়লে লোকটির দূর্নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিছু শুভাকাঙ্খী তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হতভাগা! তুঁই 'আযল' করলি না কেন ?' (চরম মূহুর্তে পৃথক হয়ে দেহের বাহিরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে)

এই প্রশ্নের জওয়াবে সে বললো, "শুনেছি আযল করা নাকি মকরূহ"!

একদিকে যিনার মত জঘন্য পাপ করছে সে দিকে খেয়াল নাই, অপর দিকে তিনি মাকরূহ্ করা থেকে বিরত থাকছেন।

তাই যারা জীবের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে মানুষ হত্যা করছেন তারা একবারও জীবের ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ সম্পর্কে ভেবে দেখেন না। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"তোমার 'রব' (সৃষ্টিকর্তা) এর উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং (নির্দিষ্ট পশু) কোরবানী কর।"

কবির ভাষায় ঃ

آنکه جان بخشدر گر بخشد رواست

" যিনি প্রাণ দান করেছেন তিনি যদি (একটি নির্দেশের দ্বারা) তা ফিরিয়ে নেন তবে আপত্তি করবার কী আছে ? "

--আশরাফুল জওয়াব।

অদ্ভুত পিস্তল

হযরত থানুবী (রঃ) এর খেদমতে এক ব্যক্তি বর্ণনা করলো, "হযরত! আমাদের ট্রেনের সফরে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের প্রচন্ড ভীড় হয়। ফলে সফর করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা একদিন কয়েকজন সঙ্গী ভীড় হওয়ার আগেই ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। ঘটনাক্রমে তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। এক সঙ্গী দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার বাহির করলেন। খাবারের সঙ্গে গরুর গোশ্তও ছিল। খাবার সাজানো হয়েছে এমন সময় একজন যাত্রী ঐ কম্পার্টমেন্টে উঠতে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে গরুর গোশতের বড় বড় হাড্ডি দেখতে পেলো।

আর তখনই 'রাম রাম' বলতে বলতে চলে গেল। সে আর সেই কামরায় উঠলো না।

এরপর আরেক জন যাত্রী আসলো। সেও প্লেটে রাখা গোশ্তের হাড্ডি দেখে চমকে উঠলো, আর তখনই 'রামো রাম' বলে চলে গেল। এভাবে যত লোকই আসে হাড্ডি দেখে 'রাম রাম' বলতে বলতে চলে যায়; ট্রেনে কেউ ওঠে না। ট্রেন ছেড়ে দিল অথচ কোন ভীড় হলো না। ফলে আমরা আরামে সফর করলাম।

আমাদের এক সঙ্গী মন্তব্য করলো, "গরুর গোশ্তের বড় বরকত ! এই গোশ্তের হাড্ডির বরকত আরও বেশী। বরং এটা হাড্ডি নয় আরামদায়ক সফরের এক অদ্ভূত পিস্তল "!

এই বর্ণনা শুনে হযরত থানুবী (রঃ) বললেন, " এরূপ করা ঠিক নয়।"

— আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়াহ্।

কারণ প্রতিটি অমুসলিমের মধ্যে মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা আছে। সেই যোগ্যতাকে শ্রদ্ধা দেখানো উচিৎ। শ্রদ্ধা দেখালেই তাদের যোগ্যতাকে কাজে লাগানো যাবে। দুনিয়াবী স্বার্থের জন্যে কারো মনে কষ্ট দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

পুলিশ পালানোর ঘটনা

বৃটিশ সরকারকে তাড়াতে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের উপর এদেশের আলেমদের জোর প্রভাব ছিল। তাই মওলানা কাসেম নানতুবী (রঃ) এর বিরুদ্ধে বৃটিশের গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। পুলিশের হাত এড়ানোর জন্যে মওলানা আত্মগোপন করেন। কিন্তু বৃটিশ পুলিশ দূরন্ত শক্তিধর। তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এক কঠিন ব্যাপার। মওলানা কাসেম এক মসজিদে এবাদতে মশগুল ছিলেন। পুলিশের দল সেখানে গিয়ে হাজির। সবাই মসজিদটি ঘিরে ফেললো। এবার আর পালাবার পথ নাই। একজন পুলিশ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মওলানা কাসেমকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কি এখানে কোথাও মওলানা কাসেমকে দেখেছেন?"

যারা মিথ্যা বলে না তাদের সাহস থাকে অপূর্ব। পুলিশের কণ্ঠ শুনে তিনি নির্ভয়ে পিছনে পুলিশের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। দরজায় পুলিশের কাছে এসে বললেন, "হাঁ, দেখেছি।" মওলানা নিজে আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই জায়গাটি দেখিয়ে বললেন, "এইতো একটু আগে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল লোকটি।"

"বলেন কি ? আমরা আসতে না আস্তেই পালিয়েছে ?" এই বলে পুলিশের দল ছুটলো মসজিদ ছেড়ে মওলানা কাসেমকে খুঁজতে।

মওলানা কাসেম আবার নির্ভয়ে এবাদতে মশগুল হলেন। তিন দিন আত্মগোপন করে থাকার পর বাহির হয়ে আস্লেন। প্রকাশ্যে বিচরণ করতে দেখে তাঁর অনুসারীগণ আরয করলেন, "হুজুর, আপনি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

মওলানা কাসেম জওয়াব দিলেন, "হাঁ রসূলুল্লাহ্ কাফেরদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিন দিন 'সওর' পাহাড়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। আমিও তিন দিনের বেশী আত্মগোপন করে থাকতে পারি না। আমি রসূলের সুন্নতের উপর আমল করেছি মাত্র"।

সেই সুন্নতের বরকতে, দেখা গেল সেই দিনই বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করেছে।

—আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্

দোয়াত-কলম ও লাঠির ঘটনা

জ্ঞানী ব্যাক্তিগণ অনেক সময় চিন্তার এমন সব জগতে বিচরণ করেন যে নিজের অস্তিত্বের কথা আংশিক ভাবে অথবা 'সম্পূর্ণভাবে ভুলে যান। অথবা নিজেকে অন্যভাবে ভেবে থাকেন।

তাছাওউফের ভাষায় একে تصرف قوة متخيلة (বা ধারণা শক্তির পরিবর্তন ক্রিয়া) বলা হয়। এই ক্রিয়ার ফলে كيفيت (বা এক বিশেষ অবস্থার) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। سالك (বা তাছাওউফ পথের অনুসারী) এইজন্যে আফসোস করে থাকেন। কিন্ত এতে আফসোস করার কিছুই নাই। কারণ এটা مقصود (বা লক্ষ্য বস্তু) নয়। مقصود হলো مقام (মকাম)। এই 'মকাম' একবার হাছেল হওয়ার পর সেটা আর দূর হয় না।

যাহোক এই كيفيت বা বিশেষ অবস্থার অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে।

একজন নির্ভরযোগ্য (ثقه) আলেমের কাছ থেকে শোনা এক পাটোয়ারীর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

দোয়াত-কলম ঃ তিনি কান্ধালা থেকে বোরহানা যাচ্ছিলেন। বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র সঙ্গে নিলেন এবং দোয়াত কলমের ব্যাপারে ধারণা জন্মালো যে দোয়াত-কলম হাতেই আছে। তাই তিনি হাত উঁচা করে আঙ্গুল দু'টি চেপে রেখে সুদূর বোরহানা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে সরাইখানার আলমারীর তাকের উপর হাতের আঙ্গুল দু'টি এমন ভাবে প্রসারিত করলেন যেন দোয়াত-কলম সেখানে রেখে দিয়েছেন। এরপর যখন লিখতে যাবেন তখন তাকের উপর দোয়াত-কলম খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু দোয়াত কোথায় ? তাকের উপর তো কোন দোয়াত নাই!

ব্যাপার কি ? খাদেমের গাফলতির কারণেই দোয়াতটি কেউ নিয়ে নিয়েছে। খাদেমকে খুব ধমকালেন।

এরপর যখন বাড়ী ফিরে আসলেন তখন দেখেন দোয়াতটি বাড়ীতেই রয়েছে।

লাঠির ঘটনা ঃ আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা আছে। এক ব্যক্তি অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলেন। শোয়ার জন্যে খাটের উপর শয্যা পাতা ছিল। তিনি শয্যার কাছে গেলেন। তাঁর ভ্রমনের লাঠিটি তখনও হাতে ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি কি করলেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

রাত্রি যখন সকাল হলো তখন বুঝতে পারলেন যে তিনি একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। যে-শয্যায় তাঁর শোয়ার কথা ছিল সেখানে তিনি না শুয়ে তাঁর লাঠিকে শুইয়ে রেখেছিলেন আর ঘরের কোণায় লাঠি রাখার জায়গায় তিনি সারা রাত ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন।

চিন্তাবিদ ব্যক্তির জন্যে এরূপ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এই ঘটনার নায়ক ছিলেন ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী একজন বড় দার্শনিক। এক ব্যক্তি তার নামও বলে দিতে পারতো। কিন্তু সে আর এখন বেঁচে নাই।

ধারণা শক্তির এই পরিবর্তন ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। কখনও বা এই ক্রিয়াকে কোন প্রয়োজন মিটাবার জন্যে ইচ্ছা করে ব্যবহার করা হয়। যেমন

আরেকটি লাঠি ঃ হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের মুহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) একবার শীতকালে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর লাঠির উপর দৃষ্টিপাত করলেন। জ্বর লাঠির গায়ে স্থানান্তরিত হলো। লাঠিটা জ্বরের প্রকোপে তখন থর থর করে কাঁপছিলো। তিনি অযু করলেন এবং নামায সমাপন করলেন। এরপর দ্বিতীয় বার লাঠির উপর দৃষ্টিপাত করে নিজের দেহে জ্বর ধারণ করে নিলেন।

এগুলির এক প্রকার ছিল فعل تصرف বা পরিবর্তন ক্রিয়ার ফল এবং অপরটি হলো فعل عبديت বা আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন ক্রিয়ার ফল।

—আল এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড ২ পৃষ্ঠা ১৪১।

বাছুরের দাওয়াত খাওয়া

আল্লামা শামী (রঃ) তাঁর কেতাবে লিখেছেন যে আলেমগণ যেন কারো ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য না দেন। কারণ তাদেরকে সকল মুসলমানের সঙ্গে সমান সম্পর্ক রাখতে হবে। তিনি একথাও লিখেছেন যে কোন আলেম যেন কারো বাড়ীতে দাওয়াতও খেতে না যান। কারণ এতে অনেক লাঞ্ছনা রয়েছে।

আবার অনেকের অভ্যাস আছে নিজের সঙ্গে দাওয়াত ছাড়া অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাওয়া। এটা আরও আপত্তিকর। বিলাতের এক ব্যক্তি একটা ঘটনা বলেছিল। সেখানে যখন কোন বাড়ীতে দাওয়াতের অনুষ্ঠান হতো তখন সবাই নিজ নিজ বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। এক ব্যক্তি এটা পছন্দ করতো না। সে মজা করার জন্যে একটি ফন্দি আঁটলো। তার একটি বাছুর ছিল। একদিন সে ঐ বাছুরটির গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে দাওয়াতের অনুষ্ঠানে হাজির হলো এবং সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, আপনারা সবাই নিজ নিজ বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়াত খেতে এসেছেন। কিন্তু আমার কোন বাচ্চা নাই। আমার এই একটি বাছুর ছিল। তাই নিয়ে এসেছি আপনাদের সাথে দাওয়াতে। এটা এখন আমার সন্তান হয়ে আপনাদের সন্তানদের সাথে খাবার খাবে।

লোকটির কীর্তি দেখে সবাই এত লজ্জিত হলো যে সেই দিন থেকে এই প্রচলন বন্ধ হয়ে গেল।

—আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ খন্ড২ পৃষ্ঠা ১০০।

স্ত্রীলোকের রুচির পরীক্ষা

এক বাদশাহ্ চারটি বিভিন্ন দেশ থেকে চারটি মেয়েলোক সংগ্রহের হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য, কোন্ দেশের মেয়েলোকের রুচি কেমন তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

তিনি তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলেন। রাত্রি যখন ভোর হলো তখন এক এক করে তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন যে বলতো রাত্রি কত বাকী আছে?

মেয়েলোকগুলি এ ব্যাপারে সবাই একমত ছিল যে রাত্রি তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 'সকাল হয়ে গেছে' এ কথাকে সমর্থন করার ভঙ্গিটি ছিল বিভিন্ন রকম। যার যে-রকম রুচি ছিল সে সেভাবেই তা' প্রকাশ করেছে।

একজন বললো, "আমার নথের মতি ঠান্ডা হয়ে পড়েছে।"

কারণ ভোর বেলায় শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। এই বাতাসের স্পর্শ লেগে সব কিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। ভোরের এই বাতাস বড় আনন্দদায়ক। মন তখন প্রফুল্ল হয়ে উঠে এবং প্রিয় জিনিষকে আরও প্রিয় মনে হয়। যেমন প্রিয় গহনাটির কথা মনে পড়ে গেছে এবং তার মধ্যে যে ছোট মতিটি ঠান্ডা হয়ে পড়েছে তা-ও অনুভব করা গেছে। ভোর বেলাতেই শুধু এরূপ সম্ভব।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি বললো, "প্রদীপের আলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।"

তৃতীয় মেয়েলোকটি বললো, "পানের স্বাদ বদলিয়ে গেছে।"

চতুর্থ জন বললো, "আমার গূ' পড়ে গেল!"

আর আমরা হলাম এই "গূ' পড়ে যাওয়া" দলের। কারণ আমাদের রুচি এত খারাব যে নোংরা জিনিষকে আমরা ইসলামের সমর্থিত বলে মনে করে থাকি। যেমন ছেঁড়া কাপড় পরা, নোংরা জিনিষ খাওয়া, নোংরা গৃহে বাস করা, শরীরে দূর্গন্ধ পোষণ করা, বিনা প্রয়োজনে মাটিতে সেজদা করে কপালে ধূলা মাখিয়ে নেওয়া ইত্যাদি।

—আল-এফাযাতুল য়্যাওমিয়্যাহ্ খন্ড১, পৃষ্ঠা ২৮৬।

অথচ কথা-বার্তায় নোংরামি সহ কোন প্রকার নোংরামি ইসলাম সমর্থন করে না। বাহুল্য বর্জন করে সুন্নত মোতাবেক নিজেকে যত সুন্দর

করা যায়, রুচি যত পরিচ্ছন্ন হয় ইসলামে তা' ততই প্রশংসনীয়। যেমন–

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

"আল্লাহ্ নিজে সুন্দর তাই তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।"

(আল-হাদীস।)

জান্নাতের খশবু

শরীয়তের প্রতি উদাসীন এলাহাবাদের এক সূফী একবার গাঙ্গুহ্তে আমার কাছে আসলো। সে আমাকে ফুলের একটি মালা দিয়ে বললো, "আজ বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে এসেছিলাম। হযরত শাহ্ আব্দুল কুদ্দুস (রঃ) এর মাযারে কিছু অর্পন করে আসলাম আর অবিশষ্টগুলি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।"

আমি তার জ্ঞান অনুযায়ী যুক্তিতে বললাম, 'দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি অত্যন্ত রুচি সম্পন্ন হয় এবং আশি টাকা ভরি মূল্যের আতর ব্যবহার করতে অভ্যস্থ থাকে আর আপনি মাত্র চার আনা দামের আতর নিয়ে গিয়ে তার কাপড়ে লাগিয়ে দেন তবে কি সেটা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হবে না? এই সব আউলিয়া কেরাম যারা কবরে শুয়ে আছেন তারা জান্নাতের খশবু পেয়ে গেছেন। জান্নাতের এই খশবু আর দুনিয়ার এই ফুলের তুলনা হলো আশি টাকা মূল্যের আতর আর (তুচ্ছ) চার আনা দামের আতর। সুতরাং কবরে এইসব তুচ্ছ ফুল অর্পন করা আউলিয়া কেরাম কি করে বরদাশ্ত করবেন? এই ফুল তাদের জন্যে বিরক্তিকর মনে হবে না কি?'

কথাটি সে বুঝতে পারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তৌবা করে ফেললো আর গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগলো যে সে জীবনে এই কাজ আর কখনো করবে না।

––আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়য়্যাহ্; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১৩।

তাবিজ সমাচার

তাবিজ সম্পর্কে মানুষের খুব বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সবকিছুতেই তাবিজ চেয়ে বসে। ভাব দেখে মনে হয় শিঘ্রই এরা বিয়ে না করেও তাবিজের দ্বারা সন্তান লাভের চেষ্টা করবে। সবকিছুতেই তাবিজ চাইতে আসার ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে পড়লো।

এক মদ বিক্রেতা হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের (রঃ) এর কাছে এসে বললো, "হযরত! মদ বিক্রী হয় না, একটা তাবিজ দিয়ে দিন।"

তিনি একটি তাবিজ লিখে দিলেন। ফলে খুব মদ বিক্রী শুরু হলো

মাদ্রাসার ছাত্ররা সন্দেহ করলো যে হযরত এটা কী করলেন ? মদ বিক্রেতাকেও তাবিজ দিলেন! এটা দেখছি গুনাহ্ করতে সাহায্য করা হলো।

বিষয়টি জানতে পেরে তিনি মদ বিক্রেতাকে বললেন, "ভাই তাবিজটি নিয়ে এসো দেখি"!

"সে তাবিজ নিয়ে আসলে খুলে তিনি ছাত্রদেরকে দেখালেন। তাতে লিখা ছিল "আয় আল্লাহ্! মদ খাওয়া যাদের তকদীরে লিখা আছে তারা তো মদ খাবেই। সুতরাং এর দোকান থেকেই যেন খায়।"

সবাই লিখাটি দেখে অবাক! এসব বুযুর্গদের বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ হতে পারে ? বস্তুতঃ মুহাক্কেক আলেমদের ভুল ধরাটাই ভুল।

—আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৯।

'যায়েদ আমরকে মারিল' কেন

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সুন্নতের অনুসরণে বড় যত্নবান ছিলেন। হযরত ওসমান হারূনী (রঃ) এর ঘটনায় তিনি বলেছেন, যেহেতু তিনি অজুতে যেভাবে খেলাল করে নামায পড়েছেন তা সুন্নত মোতাবেক ছিল না তাই অজুতে সুন্নত মোতাবেক খেলাল করে বিশ বৎসরের সব নামাজ পুনরায় আদায় করেন।

হযরত শায়খ আব্দুল হক রাদোলবী (রঃ) আল্লাহ্ পাকের এশ্‌কে এমন এক রূহানী হালতের শিকার হয়েছিলেন যাকে তাছাওউফের পরিভাষায় এস্তেগ্‌রাক বলা হয়, অর্থাৎ দুনিয়াবী সকল বিষয় থেকে অন্য এক জগতে এমনভাবে তলিয়ে গিয়েছিলেন যে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দিল্লী জামে মসজিদে খাদেমের সাহায্যে নিয়মিত নামায পড়তে যেতেন ও ফিরে আসতেন তবু একা মসজিদের রাস্তা চিনতে পারতেন না। এত কিছু ভুল হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুন্নতের উপর দৃঢ়পদ ছিলেন, সুন্নত ভুলতেন না। এমন কি তিনি একথাও বলতেন ঃ

منصور بچہ بود کہ از یك قطرہ بفریاد آمد

ایں جا مردانند کہ دریاھا فرد برند وآروغ نہ زنند

"এশকের পথে মনছুর (বিন হাল্লাজ) শিশুটি মাত্র ছিল তাই এক ফোটা (এশ্‌ক) পান করেই ফরিয়াদ করতে লাগলো।

আর এখানে একজন পুরুষ আছে যে দরিয়ার পর দরিয়া এশ্‌ক পান করে ঢেকুর পর্যন্ত তোলে না"।

দেখুন এতটা এস্তেগরাকের মধ্যে থেকেও তিনি সুন্নতের পাবন্দ রয়েছেন এবং মনছুরেরও সমালোচনা করেছেন।

এইরূপ আরেক এস্তেগরাকে নিমজ্জিত ব্যক্তির ঘটনা শুনুন। তাকে তার ভাই মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক পড়াতে চাইলেন। নহুর কেতাব শুরু করলেন প্রথমে। সেখানে একটি উদাহরণ আসলোঃ

ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا

"যায়েদ আমরকে মারিয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন মারিয়াছে?"

উস্তাদ বললেন, "মারে টারেনি, এমনি একটি উদাহরণ আর কি?"

ছাত্র বললেন, "যদি না মেরে থাকে তবে মিথ্যা কথা লিখেছে। আর যদি বিনা কারণে মেরে থাকে তবে জুলুম করেছে। আমি এমন কেতাব পড়বো না যা মিথ্যা অথবা জুলুম শিক্ষা দেয়।"

--আলএফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২০।

সুন্নীর কবরে কে এই কুকুর

আগেকালের দিনে খাঁটি লোক পাওয়া যেতো। বাদশাহ্র দরবারে সাধারণ লোকেরাও হক কথা বলতে পারতো। ওয়াজেদ আলী শাহ্ ছিলেন শিয়া। তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ্ ছিলেন। একদিন তিনি একটি যানবাহনে করে সফরে বাহির হলেন। সঙ্গে তার একজন খাদেম ছিল। সে ছিল সুন্নী। শিয়া সুন্নীতে একটা বিরোধ রয়ে গেছে। ওয়াজেদ আলী শাহ্র বাহন একটি কবরস্থান অতিক্রম করছিল। সেখানে একটি ভাঙা-চুরা কবর ছিল। কোথায় থেকে এক কুকুর এসে এক পা তুলে সেই কবরে পেশাব করতে লাগলো।

ওয়াজেদ আলী শাহ্ কবরের নমূনা দেখে ভাবলেন এটা কোন সুন্নীর কবর হবে। কারণ শিয়াদের কবর মজবূত এবং সাজানো গোছানো হয়ে থাকে। কারণ সরকার ছিল শিয়াদের। আর এরা অধিকাংশই বিত্তবান হয়ে থাকে। ওয়াজেদ আলী শাহ্ সেই সুন্নী খাদেমকে বললেন, "কবরটি মনে হয় কোন সুন্নীর হবে।"

সুন্নী খাদেম বললো, "জী হুজুর! ঠিক বলেছেন। সেই জন্যেই তো শিয়া কুকুরটি সেখানে পেশাব করছে।"

কত সাহস একজন খাদেমের। যুক্তি সঙ্গত কথা বলতে একজন অধিনস্থ কর্মচারী বাদশাহ্‌রও পরোয়া করে না। তাদের এবাদত ছিল খালেছ আর ঈমান ছিল মজবুত।

আর আজকাল হক কথা মালিকও সহ্য করতে পারে না, কর্মচারীও সহ্য করে না। যুক্তি সঙ্গত কথায় স্বার্থে আঘাত লাগলে আর রক্ষা নাই। সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে বিব্রত।

——আলএফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্‌; খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪৫।

খরগোশের গোশত্‌ নিয়ে বিতর্ক

উপরের ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ) একবার লক্ষ্ণৌ গমন করলেন। সেখানে অবস্থানের সময় একদিন তিনি একটি খরগোশ শিকার করে এনে জবাই করে এক পাশে রাখলেন। এক শিয়া মুজতাহেদ হযরত মওলানার সাথে দেখা করতে আসলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি কুকুর এসে জবাই করে রাখা খরগোশটিকে শুঁকতে লাগলো। কতক্ষণ শুঁকার পর কুকুরটি চলে গেল।

মুজতাহেদ সাহেব মওলানা সাহেবকে বললেন, "দেখুন মওলানা সাহেব কুকুরেও খরগোশ খায় না।" (এই কথা বলার কারণ হলো শিয়া মজহাবে খরগোশ খাওয়া হারাম।)

মওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন, "এই খরগোশ কুকুরের খাওয়ার জিনিষ নয়, এটা মানুষের খাদ্য।"

তিনি এত সুক্ষ্ম এবং ভদ্রভাবে শিয়াকে কুকুর এবং সুন্নীকে মানুষ বললেন যে শিয়া মুজতাহেদ সাহেব হতবাক হয়ে পড়লেন। তার জওয়াব দেওয়ার আর কিছুই থাকলো না।

হযরত মওলানা ছিলেন স্বয়ং এক খোলা তরবারি। মুহূর্তেই বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত তার কাছে স্বার্থপরতা খুঁজে পাওয়া যেতো না।

——আলএফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্‌ ;খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪৫।

মুরীদের পরীক্ষা

যারা মুরীদ হতে চেয়েছে আমাদের আগেকালের বুযুর্গগণ তাদেরকে কঠিন পরীক্ষা নিয়ে তবে মুরীদ করেছেন। যেমন ঃ

এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি মুরীদ হতে আসলো। তিনি তাকে এক মারাত্মক পরীক্ষা নিলেন। তিনি বললেন, "দেখ ভাই আমি এক মুছিবতে জড়িয়ে পড়েছি। বিষয়টি গোপনীয় তাই মুরীদদের কাছে একথা বলা যায় না। তাতে আমার প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে। আর তুমি এখনও আমার মুরীদ হওনি। তাই বিষয়টি তোমার কাছে প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার।

বিষয়টি হলো এই যে আমি একটি স্ত্রীলোককে ভালবাসি। অনেক চেষ্টা-তদবীর করার পর সে ওয়াদা করেছে যে এক রাত আমার কাছে কাটাবে। আজ সেই রাত। একটি বিশেষ সংকেত দিলেই সে বাড়ী থেকে বাহির হয়ে আসবে, তুমি তাকে সঙ্গে করে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসবা। তার বাড়ীর ঠিকানা হলো এই।

বুযুর্গ ভাবলেন এখন এই লোকটি চলে যাবে আর কখনও আমার কাছে মুরীদ হতে আসবে না। মনে করবে এ আবার কেমন বুযুর্গ। এ তো রীতিমত একজন যিনাকার!

কিন্তু লোকটি নির্দেশমত সেই স্ত্রী লোককে নিয়ে হাজির হলো।

বুযুর্গ ভাবলেন রাত পোহালে লোকটিকে আর দেখা যাবে না।

কিন্তু স্ত্রী লোকটির সঙ্গে রাত্রি যাপনের পর ভোর বেলায় যখন বাহির হলেন তখন দেখেন লোকটি চুলা জ্বালিয়ে ঘড়ায় পানি গরম করছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করছো?"

লোকটি বললো, "হযরত! আপনার গোছলের পানি গরম করছি।"

আসলে এই স্ত্রী লোকটি ছিল বুযুর্গের বিবি। কিন্তু লোকটির পরীক্ষা ছিল এত কঠিন যে এখানে টিকে থাকা বড় মুশকিল ছিল। পরীক্ষার দ্বারা বুযুর্গের সাথে লোকটির নেস্‌বত কায়েম হয়ে গেল। এখন মুরীদ করলে

তার এছলাহ্ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে।

--আলএফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ; খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩১।

কঠিন পরীক্ষা

মুরীদের এছ্‌লাহের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের তরীকা এবং মুরীদদের পরীক্ষা বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু তবুও মুরীদগণ দৃঢ়পদ থেকেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার গৃহীত ব্যবস্থা সেই পর্যন্ত পৌঁছেনি। তবুও আমাকে বদনাম দেওয়া হয় এবং বলা হয় বড় কঠিন ব্যক্তি। অথচ আমি কখনো পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছাও করি না। প্রথম থেকেই তালিম করা শুরু করে দিই। কিন্তু বুযুর্গানে সল্‌ফ সর্ব অবস্থাতেই পরীক্ষা নিয়েছেন।

এক ব্যক্তি এক বুযুর্গের কাছে "ইস্‌মে আযম" এর সন্ধান চেয়েছিল। তিনি জানতে পারলেন যে লোকটির মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করার শক্তি নাই। না জানি কাকে কাকে শিখিয়ে বেড়াবে। সুতরাং সে এই বস্তুর উপযুক্ত নয়।

লোকটি আরয করলো. "হযরত! কখনও আপনার হুকুমের খেলাফ করবো না।"

বুযুর্গের অত্যন্ত রসবোধ ছিল। তিনি বললেন, "আচ্ছা অপেক্ষা কর।"

সে অপেক্ষা করলো।

কয়েকদিন পর তিনি দুই প্লেট একত্র করে ঢেকে এনে লোকটিকে দিলেন এবং বললেন, "অমুক মসজিদে এক বুযুর্গ থাকেন তাঁকে এটা দিয়ে এসো। রাস্তায় খুলে দেখো না।"

লোকটি নিয়ে চললো। এখন রাস্তায় মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো--এর মধ্যে এমন কী আছে? যদি বুযুর্গ একথা না বলতেন যে খুলে দেখিও না, তবে মনে হয় এত উৎসুক সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তাঁর একথা বলে দেওয়াটাই সর্বনাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবলো, এর মধ্যে এমন কী জিনিষ

আছে যে খুলে দেখতে নিষেধ করেছেন ? মনে হয় কোন খাওয়ার জিনিষ আছে। আর মনে হয় তিনি এজন্যে নিষেধ করেছেন যেন খেয়ে না ফেলি। ঠিক আছে আমি খাবো না। সুতরাং একবার খুলে দেখা উচিৎ।

এই ভেবে যেই প্লেট উঁচা করলো আর অমনি তার ভিতর থেকে একটি ইঁদুর লাফিয়ে পড়লো এবং দৌড়ে পালালো। এখন লোকটি ভারী পেরেশান হলো। ইঁদুর এমন জিনিষ যে তাকে আর ধরা সম্ভব নয়।

সুতরাং খালি প্লেট নিয়ে মসজিদের সেই বুযুর্গের কাছে গিয়ে হাজির হলো এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। তিনি বললেন, "মনে হয় তুমি তাঁর কাছে কোন কিছু আবেদন করেছিলে তাই তিনি তোমার পরীক্ষা নিলেন।"

লোকটি বড় লজ্জিত হলো এবং তার বুযুর্গের কাছে ফিরে আসলো। শায়খ বললেন, "এখন আর তুমি আমার কাছে "ইস্‌মে আযম" জানতে চেয়ো না। যখন তুমি সামান্য একটি জিনিষের হেফাজত করতে পারলা না তখন ইস্‌মে আযমের মত এত বড় জিনিষের হেফাজতের আশা তোমার কাছে করা যায় না।

--আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্ ;খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩১-৩২।

আরেক পরীক্ষা

এক বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর কাছে যে ব্যক্তি মুরীদ হতে আসতো তিনি তার কাছে খাদেমকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে বলতেন, "এই ব্যক্তি যখন খাবার খেয়ে সারবে তখন অবশিষ্ট খাবার আমাকে দেখায়ো।" খাদেম তাই করতো। বেঁচে থাকা খাবার শায়খ পরীক্ষা করতেন। তিনি দেখতেন বাস্তবে তার খাবার বাঁচানোর প্রয়োজন ছিল কিনা। আর ভাত যতটুকু বেঁচেছে তরকারী সেই পরিমাণ বেঁচেছে কিনা যতটুকু দিয়ে সেই ভাতটুকু খাওয়া চলে। যদি তা না হতো তবে তিনি বলে দিতেন, "তোমার মধ্যে শৃঙ্খলা নাই। সুতরাং তোমার মেজাজের সঙ্গে আমার মেজাজের মিল হবে

না। তাই তোমাকে মুরীদ করবো না।”

——আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ; খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩২।

মজযূবের বহুরূপ

যে সকল বুযুর্গ সৃষ্টি সম্পর্কিত খেদমতে নিয়োজিত আছেন তারা রয়েছেন গোপনভাবে। তাঁদের শান হলো হযরত খিজির (আঃ) এর মত। তাঁদের খোঁজ পাওয়া বড় মুশকিল। তাঁরা গোয়েন্দার মত গোপনে থাকেন। এই জন্যে তাদেরকে তালাশ করা বৃথা। অপরদিকে যেহেতু তাঁরা সৃষ্টি সম্পর্কিত কাজের জন্যে নির্দেশ প্রাপ্ত এবং সে কাজে তাঁরা বাধ্য তাই তাদেরকে যদি সন্তুষ্ট রাখ তবে তাতে তিনি তোমার কোন উপকার করতে পারবেন না আবার তাদেরকে অসন্তুষ্ট করলেও তাঁরা কোন ক্ষতি করতে পারেন না। তাঁরা যা-কিছু করেন, শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের হুকুমে করে থাকেন।

ফেরীওয়ালা রূপে মজযূব ঃ

একবার হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয সাহেব (রঃ) এর যামানায় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো যে “হযরত! আজকাল দিল্লীর শাসন ব্যবস্থায় বড়ই মন্থরতা ছেয়ে পড়েছে। সব কাজের মধ্যেই যেন কুয়াশা বিরাজ করছে। চারিদিকে যেন স্থবিরতা, কোথাও চঞ্চলতা নাই।”

তিনি বললেন, “জনাব, আজকাল এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদেম বড় ঢিলা আছেন। কাজে দ্রুততা এবং চঞ্চলতার জন্যে দরকার কঠিন ব্যবস্থাপনার”।

লোকটি বললো, “বর্তমানে কে সেই খাদেম, যিনি এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন ?”

তিনি বললেন, “বাজারের অমুক দিকে যে ফেরীওয়ালা খরবুজা বিক্রী

করছে তিনিই হলেন সেই খাদেম।"

লোকটি আরজ করলো, "গিয়ে দেখা করে আসি ?"

তিনি বললেন, "যাও, গিয়ে দেখা করে এসো।"

এই লোক তাঁর কাছে গেল। গিয়ে সালাম আরজ করলো, তারপর আরজ করলো, "আমার কিছু খরবুজার দরকার"।

বিক্রেতা বললো, "ঠিক আছে, নিয়ে যাও।"

সে বললো, "আগে দেখে নেই, পান্‌সা না হয়।"

বিক্রেতা বললো, "ঠিক আছে দেখে নিন।"

লোকটি ঝুড়ি থেকে একটা খরবুজা কেটে চেখে দেখে বললো, "পান্‌সা!"

তারপর আরেকটা কাটলো এবং বললো, 'এটাও পানসা'। এভাবে বিক্রেতার সমস্ত খরবুজা কেটে চেখে দেখে "পান্‌সা" বলতে বলতে চলে গেল। খরবুজা খরীদ করলো না। বিক্রেতা বললো, "ঠিক আছে।"

লোকটি হযরত শাহ্ সাহেবের কাছে এসে সকল কথা বললো। তিনি বললেন, "এই হলো খেদমতের দায়িত্বে নিয়োজিত বুযুর্গ, যিনি অত্যন্ত মন্থর এবং গতিহীন তাই তাঁর প্রভাব প্রকাশ্য শাসক গোষ্ঠীর উপর পড়েছে"।

ভিস্তিওয়ালা রূপে মজযূব ঃ

এক মাস যেতে না যেতে হঠাৎ করে সকল কাজে উন্নতি দেখা দিল। জনগণের মধ্যে চঞ্চলতা এবং দ্রুত গতি ফিরে এলো। লোকটি আবার হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ) এর কাছে গিয়ে আরজ করলো, "আজকাল দিল্লীর কাজ কামে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যেন আলোর ঝলকানি শুরু হয়ে গেছে। জনগণের মধ্যে দ্রুততা এবং কর্মক্ষমতা ফিরে এসেছে।"

তিনি বললেন, "এখন দাযিত্বপ্রাপ্ত খাদেমও এইরূপ দ্রুত ও কর্মক্ষম।"

লোকটি আরজ করলো, "কে তিনি খাদেম ?"

তিনি বললেন, "ফতেহ্‌পুর বাজারে এক ভিস্তিওয়ালা একটি ফুটা-পয়সার বিনিময়ে এক কৌটা পানি পান করিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনিই

দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই খাদেম। দুই টিনের কৌটার ঝংকার দিয়ে গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি।"

লোকটি বললো, "তাহলে গিয়ে দেখা করে আসি ?"

তিনি বললেন, "যাও, গিয়ে দেখা করে এসো।"

লোকটি ফতেহ্পুর বাজারে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে দেখলো এক ব্যক্তি কাঁধে মশক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কৌটা বাজিয়ে ঝংকার সৃষ্টি করে বলে বেড়াচ্ছে "এক পয়সায় এক কৌটা পানি।"

লোকটি একটি ফুটা পয়সা দিয়ে এক কৌটা পানি চেয়ে নিল। এরপর "পানিতে কুটা আছে" বলে পানি ফেলে দিল এবং আবার পানি চাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আরও পয়সা আছে ?"

লোকটি বললো, "আমার কাছে আর পয়সা নাই।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে এক থাপ্পড় মেরে দিলেন এবং বললেন, "পয়সা যখন ছিল না তখন কেন আরেক কৌটা চাইলি, খরবুজাওয়ালা ভেবেছো বুঝি ?"

এই কথা শুনে লোকটি দৌড়ে পালালো। হযরত শাহ্ সাহেবের কাছে এসে ঘটনা ব্যক্ত করলো যে হযরত! তিনি তো খুবই ক্ষীপ্র!

হযরত বললেন, "এইবার তুমিই দেখে নাও!"

মুচি রূপে মজযূব ঃ

উপরের ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা আছে। এক ব্যক্তি হযরত মওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, "হযরত! আমি এই সৃষ্টির পরিবর্তনের খেদমতে নিয়োজিত বুযুর্গকে দেখতে চাই।"

তিনি বললেন, "বেশ! একটা চিনা মাটির ঠিক্‌রা নিয়ে এসো।"

লোকটি একটা ঠিক্‌রা নিয়ে আসলো। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) তাতে কয়েকটি রেখা এঁকে দিয়ে বললেন, "অমুক জায়গায় সরকারী সেনা বাহিনীর ক্যাম্প আছে। সেখান থেকে কিছু দূরে এক ব্যক্তি বসে জুতা সেলাই করছে দেখতে পাবা। তাকে গিয়ে এই ঠিক্‌রাটা দিবা।"

লোকটি ঠিক্‌রা নিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো। দেখলো এক ব্যক্তি বসে জুতা সেলাই করছে। জাহেরী চেহারাও মুচির মত বানিয়ে রেখেছিলেন। লোকটি তাঁকে ঠিকরাটি দিল। ঠিকরাটি দেখেই তিনি জুতা সেলাইয়ের যত সাজ-সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়ে ছিল এক জায়গায় জমা করলেন। ওদিকে সেনা অফিসার বিউগল বাজালেন যে এখান থেকে যেতে হবে সব সাজ-সরঞ্জাম একত্রে জমা করে নাও।

তারপর বুযুর্গ সেই জমা করা সেলাই সরঞ্জামকে তাঁর থলির ভিতর ভরলেন। তখন সেনা অফিসার দ্বিতীয় বিউগল বাজিয়ে বললেন, "সকল তাঁবু খুলে ফেল এবং খুঁটি তুলে ফেল।"

সেনা বাহিনী নির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি সহ তাঁবু গুটিয়ে ফেললো।

এইবার তিনি সেলাই সরঞ্জামের থলিটি গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বাজলো যে সবাই রওয়ানা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। সৈনিকগণ তাই করলো।

এরপর তিনি কী মনে করে থলি সহ বসে পড়লেন। তখন বিউগল বাজলো যে সবাই নিজ নিজ সরঞ্জাম নামিয়ে রাখ। সৈনিকগণ নির্দেশমত তাই করলো।

তারপর তিনি তাঁর থলি খুলে সব সেলায়ের সরঞ্জাম বাহির করে রাখলেন। তখন সেনা অফিসার বিউগল বাজিয়ে নির্দেশ দিলেন সমস্ত তাঁবু স্থাপন করতে। সৈনিকরা তাই করলো।

এরপর তিনি সেলায়ের সরঞ্জামগুলি ছড়িয়ে রাখলেন। তখন বিউগল বাজিয়ে নির্দেশ হলো সকল সরঞ্জাম যথাস্থানে স্থাপন করতে। সৈনিকরা তাই করলো।

সেই মুচি বুযুর্গ আবার কী মনে করে তার সামানগুলি গুছিয়ে থলিতে ভরে উঠে দাঁড়ালেন। সেনা অফিসার নির্দেশ দিলেন তাঁবু গুছিয়ে রওয়ানা হওয়ার জন্যে তৈরী হও। সৈনিকগণ তাই করলো।

বুযুর্গ আবার বসে পড়লেন। থলির জিনিষপত্র যথাস্থানে ছড়িয়ে রাখলেন। তখন বিউগল হলো, "সৈনিকরা তাঁবু স্থাপন কর"।

এইভাবে কয়েকবার হলো। সৈনিকরা তখন পরস্পর বলতে লাগলো যে

সেনা অফিসারের মাথা খারাব হয়ে গেছে তার চিকিৎসা করা দরকার। (কিন্তু তারা বুঝতে পারলো না আড়ালে পরিচালনা-শক্তি কোথায় থেকে আসছে এবং কার নির্দেশ পালিত হচ্ছে)।

সেই লোকটি এই সব তামাশা দেখে সেখান থেকে দ্রুত হযরত শাহ্ সাহেবের কাছে এসে সকল ঘটনা ব্যক্ত করলো। তিনি বললেন, "আহ্লে খেদমত এই রকমই হয়ে থাকেন।"

কানপূরের ঘটনাঃ

একবার কানপুর এবং তার আশেপাশে নামাজী এত অধিক হলো যে নামাজীর ভীড়ে কোন জায়গা আর বাকী থাকলো না। একটি সূত্র থেকে জানা গেল যে সেই সময় সেখানে যে 'কুতুব' ছিলেন তিনি নামাজী ছিলেন। তারই প্রভাব পড়েছিল জন সাধারণের উপর। ফলে যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন নামাজ পড়েনি সে-ও নামাজ পড়তে লেগে গেল।

শায়খ্ আকবর বলেন প্রত্যেক গ্রামে (মহল্লায়) একজন কুতুব থাকেন। কিন্তু এরা অধিকাংশই মজযূব হয়ে থাকেন। আর অধিকাংশ মজযূব বুযুর্গগনের হাতেই সৃষ্টির পরিবর্তনের কাজ নিয়োজিত থাকে। কখনও কখনও সালেক বুযুর্গগণও এরূপ দায়িত্ব পেয়ে থাকেন।

—আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৭ পৃষ্ঠা ২০-২২।

বিয়েতে
কন্যা পক্ষের অদ্ভুত শর্ত

এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো, "আমার ভুঁড়ি এত বেড়ে গেছে যে নাভীর নীচের নাপাক পশম ছাফ করতে পারছি না"। লোকটি একথাও বললো যে অমুক আলেম বলেছেন যেন স্ত্রীকে দিয়ে ছাফ করিয়ে নিই। বেশ বড় আলেম তিনি; তবু আমার দ্বিধা দূর হচ্ছে না। তাই বড় পেরেশান আছি।

আমি বললাম, "এখানে আরেকটি কথা আছে। যদি স্ত্রীর মনে ক্রোধ থাকে আর সে ক্ষুর দিয়ে সবটুকুই পরিষ্কার করে ফেলে তাহলে অবস্থাটা

কী দাঁড়াবে ?"

অতঃপর আমি একটি লোশন বানানো শিখিয়ে দিলাম। লোকটি বড় খুশী হয়ে চলে গেল।

তাই বলি, এলেমের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও দরকার। আর বুদ্ধি নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপর। আবার একথাও সত্য যে বৃদ্ধরাই অধিক অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। এইজন্য আমি আজকাল অধিকাংশ নওজোয়ান আলেমদেরকে বলি, তোমরা আলেম হয়েছো বটে কিন্তু বৃদ্ধ হতে পারনি। তাই বৃদ্ধ এবং প্রবীণদের সাথে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে কাজ করিও। প্রবীণ লোক ছাড়া কোন কাজ হয় না। এই বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়লো।

এক বিয়েতে কন্যাপক্ষ শর্ত আরোপ করলো যেন বরযাত্রীদের মধ্যে কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি না আসে। একথা এক বৃদ্ধ জানতে পেরে বললো, "আমাকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে চল, তা না হলে তোমরা বিপদে পড়বে।"

সবাই বললো, "যখন কন্যাপক্ষ দেখতে পাবে তখন ঝগড়া শুরু করে দিবে।"

বৃদ্ধ বললো, "তাহলে একটা কাঠের বাক্সতে গোপনে ভরে নিয়ে চল।"

অতঃপর তাই করা হলো। প্রবীণ ব্যক্তিটিকে একটি কাঠের বাক্সে ভরে নিয়ে চললো।

সেখানে পৌঁছার পর কন্যাপক্ষ বললো, "প্রত্যেক ব্যক্তি একটি করে বকরী খাবে তাহলে বিয়ে দিব। নতুবা বিয়ে দেওয়া হবে না।"

সবাই খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। একটা বকরী একজনে খাওয়া কি করে সম্ভব ? চিন্তায় চিন্তায় সবাই ঘেমে উঠলো। অবশেষে সেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়লো। গিয়ে গোপনে কাঠের সেই বাক্স থেকে বৃদ্ধকে বাহির করে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী করা যায়' ?

বৃদ্ধ বললো, "প্রত্যেকেই একটি করে বকরী নিয়ে খেতে লেগে যাও। যত দিনই লাগুক একটি করে বকরী একজন খেয়ে শেষ করতে পারবে। কারণ এরা কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।"

ফলে তাই হলো। সবাই কয়েক দিনে একটা করে বকরী খেয়ে

ফেললো। এরপরও এরা দাবী করতে লাগলো, "পেট ভরেনি, আরও চাই।"

কিন্তু কন্যাপক্ষ ভাবলো, এ দেখি মহা বিপদ! কতদিন আর এত মেহ্মান টানা যায়। সুতরাং তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বিদায় করলো।

এভাবে একজন বৃদ্ধের কারণে নওজোয়ানরা একটা বড় সঙ্কট উত্তীর্ণ হলো।

--আল-এফাযাতুল য়্যাউমিয়্যাহ্ ;খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৩-১৪।

বরযাত্রীদের দূর্দশা

বৃদ্ধ লোকের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উপরের ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা আছে। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বরযাত্রী দলের সঙ্গে এক বিয়ে বাড়ীতে গেল। সেখানে কন্যাপক্ষের লোকেরা বরযাত্রীদের সকলের দুই হাত সোজা করে কুনুই সমেত বাঁশের খাপ্চি দিয়ে বেঁধে দিল আর বললো, 'এভাবেই খেতে হবে'।

কিন্তু কী মুশকিল! হাত যে সোজা হয়ে থাকলো, বাঁকা করা যায় না, মুখে খাবার দিবে কিভাবে? একজন আরেক জনের দিকে তাকায়। সটান করে বাঁধা হাত নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। খেতে পারে না। অবশেষে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি করা যায়'?

প্রবীণ বললো, "চিন্তার কোন কারণ নাই! একজন আরেক জনের সামনে বসে পড়। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের লোকটির মুখে লোকমা দিতে থাক। এভাবে যত খুশী পেট ভরে খেয়ে নাও।"

বৃদ্ধের পরামর্শে এভাবে নওজোয়ানরা বিপদ থেকে মুক্তি পেল।

--আলএফাযাহ্; খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৪।

বৃদ্ধ হওয়ার সুবিধা

উপরের ঘটনা দুইটিতে দুনিয়ায় বৃদ্ধ লোক থাকার বরকত কত তা ব্যক্ত হয়েছে। এবার পরকালে বৃদ্ধ লোকের সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনুন ঃ

হাদীস শরীফে আছে যে আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মানজনক ভাবে বিবেচনা করে থাকেন।

ইয়াহিয়া ইবনে আকছাম (রঃ) ছিলেন বোখারী শরীফের উস্তাদ। তিনি এই হাদীসটি মনে রেখেছিলেন। যখন তাঁর এন্তেকাল হলো এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করা হলো তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বৃদ্ধ! তুমি কী নিয়ে এসেছো ?"

ইয়াহিয়া চুপ হয়ে রইলেন।

আল্লাহ্ পাক আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি এবারও চুপ থাকলেন।

তৃতীয় বার আল্লাহ্ পাক বললেন, "এই বৃদ্ধ! জিজ্ঞাসা তোমাকেই করছি, জওয়াব দিচ্ছ না কেন" ?

তিনি আরজ করলেন, "আয় আল্লাহ্! জওয়াব কী দিব, চিন্তা করছি।"

আল্লাহ্ বলেন, "কী চিন্তা করছো ?"

তিনি আরজ করলেন, "আমি সনদ (সূত্র) সহ একটি হাদীস শুনেছি।" এই বলে তিনি সনদ বয়ান করলেন। তারপর হাদীস ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِىْ مِنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم

'আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মানজনক বিবেচনা করে থাকেন।'

কিন্তু আজ দেখছি বিপরীত আচরণ করা হচ্ছে, তাই চিন্তা করছি"।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, "তুমি হাদীস ছহী শুনেছো। নিশ্চয় আমি বৃদ্ধদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে থাকি। যাও, আজ শুধু বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তোমাকে নাজাত দিয়ে দিলাম।"

জীবনের সমস্ত এবাদত কবুল হয়ে গেল।

--আল এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ; খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৪।

নকল বৃদ্ধ

সারা জীবনের এবাদত শুধু মাত্র বৃদ্ধ হওয়ার কারণে কবূল হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই বৃদ্ধ হওয়া যায় না। তাই এক যুবক তার এবাদত কবূল করানোর জন্যে বৃদ্ধ হওয়ার ভান করলো। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে তার এক বন্ধুকে ওছিয়ত করলো, "যখন আমি মরে যাবো, আর যখন গোছল ও কাফন পরানোর পরে কবরে রাখা হবে তখন তুমি কিছু আটা সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। তারপর তুমি কবরে রেখে যখন কাফন খুলবা তখন সেই আটা আমার দাড়িতে ছিঁটিয়ে দিও। অন্য কাউকে বললে এ কাজটি করবে না। কিন্তু তোমার উপর আমার আস্থা আছে। তুমি অবশ্যই এই কাজ করবা। কারণ তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

অতঃপর এরূপই করা হলো।

তারপর যখন এই মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "এই আটা দাড়িতে ছিঁটানোর কারণ কি ছিল

লোকটি আরজ করলো, "আয় আল্লাহ্! আমি আলেমদের কাছে একটি হাদীস শুনেছিলাম যে আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে থাকেন। কিন্তু আমি জোয়ান ছিলাম। আমার দাড়ি ছিল কালো। বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। ইচ্ছা করে বৃদ্ধ হওয়া যেতো না। কিন্তু ইচ্ছা করে নকল বৃদ্ধ হওয়া যেতো। তাই আটা ছিঁটিয়ে নিয়েছিলাম যেন সাদা দাড়ি দেখে আল্লাহ্ তা'লার দয়া হয়, সকল ত্রুটি মাফ করে দিয়ে আমার এবাদত কবূল করে নেন।"

আল্লাহ্‌র আযারের ভয়ের এত ফিকির থাকার কারণে তৎক্ষণাৎ হুকুম হলো--যাও, তোমাকে নাজাত দিলাম।

--আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৫।

ভরাডুবি

কাজ হলো আল্লাহ্ পাকের এবাদত করা। এই কাজ না করে শুধু বড় বড় আশা করা এবং আকাশ-কুসুম চিন্তা করা একটা বড় রকম ফেতনা।

যেমন কেউ কেউ বলেন, যদি প্রত্যেক মুসলমানের কাছ্ থেকে এক পয়সা করে চাঁদা নেওয়া যায় তবে লক্ষ-কোটী টাকা জমা হয়ে যাবে। তারপর সেই টাকা মুসলমানদের কল্যানে ব্যয় করা যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি সূরা বাকারা এক মিনিটে সাত বার পড়ে নেওয়া যায় তবে সাত আসমানের বাদশাহ্ হয়ে যাওয়া যায়। এই সব কল্পনায় কষা হিসাব বাস্তবে কোন কাজে আসে না। যেমন ঃ

এক মুদির দোকানদার মহিষের গাড়ীতে করে তার বিবি বাচ্চা নিয়ে সফরে বাহির হলো। কিছু দূর অতিক্রম করার পর রাস্তায় এক নদী পড়লো। গাড়ী থামিয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো নদী পার হবে কিভাবে। অবশেষে ভাবলো নদীর পানি মেপে দেখা যাক।

মেপে দেখলো কোথাও গিরা পানি, কোথাও হাঁটু পানি, কোথাও কোমর পানি, কোথাও বুক পানি, আবার কোথাও গলা পানি এবং কোথাও বা মাথার উপরে। এইবার সে ভাবলো এই মাপটির একটি গড় হিসাব বাহির করে দেখা যাক কত হয়। কাগজ কলম নিয়ে সে হিসাব কষতে বসে গেল। হিসাব করে দেখে নদীতে গড়ে কোমর সমান পানি আছে।

সে খুশী হয়ে নদীতে গাড়ী নামিয়ে দিল। কারণ কোমর পানিতে গাড়ী ডুববেনা। কিন্তু গাড়ী যেই নদীর মাঝখানে গেল আর অমনি গাড়ীটি পানিতে তলিয়ে গেল। অনেক কষ্টে সে সাঁতরিয়ে যখন কূলে উঠলো তখন দেখে বিবি বাচ্চার লাশ মরে ভেসে উঠেছে। কাগজের হিসাব তো ঠিকই আছে অথচ পরিবার ডুবলো কেন একথা সে বুঝতেই পারলো না।

তাই কাগজের হিসাবই যথেষ্ট নয়, বুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। আর সেজন্যে জ্ঞানী আলেমের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

—আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ্; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৫।

আযানের আওয়াজ অমুসলিমদের জন্যেও উপকারী

ইসলাম এবং ইসলামের বিধানগুলি মানুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত। অবশ্য সেই মানুষের প্রকৃতিটা স্বচ্ছ হতে হবে। তাহলে বুঝতে পারবে ইসলামের বিধানগুলি তার কত আপন।

এক রাজ্যের হিন্দুরা মুসলমানদেরকে আযান দিতে বাধা দিত। অবশেষে বিচার গেল সেখানকার হিন্দু রাজার কাছে।

রাজা হিন্দুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুসলমানেরা আযান দিলে তোমাদের ক্ষতি কি ?"

হিন্দুরা বললো, "আযানের আওয়াজ শুনলে আমাদের দেবতা পালিয়ে যায়।"

এইবার রাজা তার মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনার কি মনে আছে একবার আমাদের একটি ঘোড়া ছিল, সে কামানের আওয়াজের ভয়ে ছুটে পালাতো ? তারপর তাকে ময়দানে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার কাছে কামান দাগানো হতে লাগলো। ফলে সে সেই আওয়াজে অভ্যস্থ হয়ে পড়লো এবং ভয় দূর হয়ে গেল। কামানের আওয়াজে সে আর পালাতো না।

"এইভাবে যদি আযানের আওয়াজে দেবতা পালায় তবে দেবতাকে ধরে রাখার ঐ একই ব্যবস্থা। বেশী করে আযান দেওয়া হউক। আযানের আওয়াজে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে ভয় দূর হয়ে যাবে। দেবতা আর পালাবে না। কারণ দেবতাকে ধরে রাখা আমাদের দরকার আছে। কোন বিপদে আপদে বা যুদ্ধের সময় যদি দেবতাদের সাহায্য দরকার হয় আর ঠিক তখনই মুসলমানেরা আযান দিয়ে দেয় তাহলে দেবতারা পালিয়ে যাবে আমাদেরকে সাহায্য করার আর কেউ থাকবে না। তখন মুসলমানদের কাছে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাই বেশী করে আযান দেওয়া হউক।"

রাজা বিচারে এই ফয়সালা দিলেন।

আসলে তাই। ইসলামের প্রতি সকল মানুষের একটা জন্মগত আকর্ষণ রয়ে গেছে। যদি সামাজিক বাধা না থাকতো তবে সব অমুসলিমই ইসলাম গ্রহণ করে নিতো।

--আল-এফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ; খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৯।

এক ছাত্রের কীর্তি

পবিত্র কোরআনের শব্দগুলিই শুধু পড়ার জিনিষ। শব্দের ভিতরে অর্থ পড়াও যায় না লিখাও যায় না। কারণ অর্থটা শব্দের আড়ালে থাকে। তা' শুধু বোঝা যায়।

এই আড়ালে থাকা প্রসঙ্গে এক ঘটনা মনে পড়ে গেল। নাহ্বীগণ বলেন যে, ضَرَبَ এর মধ্যে هُوَ (যমীর مُسْتَتَر বা) আড়ালে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে هُوَ সর্বনামটি দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু এক ছাত্র, কথাটি এইভাবে বুঝলো যে ضَرَبَ এর ভিতরে هُوَ (সর্বনামটি) লুকিয়ে আছে। তিনি ضَرَبَ কে আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে লাগলেন, কোথায় هُوَ লুকিয়ে আছে দেখবেন। ঘষতে ঘষতে কাগজ ক্ষয় হয়ে ঐ জায়গাটা ছিদ্র হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে অপর পাতায় ঠিক ঐ সোজা একটা هُوَ ছিল। ছাত্রটি খুব খুশী হলো। ভাবলো, উস্তাদ ঠিকই বলেছিলেন যে ضَرَبَ এর ভিতরে একটি هُوَ লুকিয়ে আছে। আমি কাগজ ফুটা করে তা পেয়ে গেছি। সে খুশীতে দৌড়াতে দৌড়াতে উস্তাদের কাছে গিয়ে বললো; দেখুন আমি ضَرَبَ ঘষে সেই লুকিয়ে থাকা هُوَ টা পেয়ে গেছি।

উস্তাদ তার কথা শুনে তো অবাক। তারপর খুব হাসলেন এবং আবার বিষয়টি বুঝিয়া দিলেন।

--এলম ওয়া আমল, পৃষ্ঠা-৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলি হযরত থানুবী (রঃ) এর পবিত্র মেজাজ অনুযায়ী বলে মনে হয়। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগৃহীত। পাঠকের ফায়েদা হবে মনে করে এখানে সংযোজন করা হলো।

বাঘের উপদেশ

এলেমের জোরই বড় জোর। এলেমের এই শক্তির কারণে মানুষ দুনিয়ার সব-কিছুর উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। দুনিয়ার সবকিছুই মানুষের বাধ্য। নীচের ঘটনাটি এই সত্যকে প্রস্ফুটিত করেছে ঃ

এক বাঘ ছিল। জঙ্গলের বাদশাহ্ ছিল সে। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার একমাত্র বাচ্চাটিকে বললো, "দেখ বাবা! মিলে মিশে থেকো, সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করিও, সবার কাছে যেয়ো কিন্তু এই মানুষ জাতের কাছে যেয়ো না। এই বস্তুটা বড় অত্যাচারী এবং জালেম। যদি কোন সময় তার কাছে যাও তবে তোমার মস্ত বড় ভুল হবে। বিপদে পড়ে যাবা।"

এই উপদেশ প্রদানের পর জঙ্গলের সেই বাদশাহ্ ইন্তেকাল করলেন। তার মৃত্যুর পর তার বাচ্চা তার স্থলাভিষিক্ত হলো। জঙ্গলের বাদশাহ্ হলো এখন সে। বাঘের বাচ্চার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে ভাবলো, "আমার বাপ বলেছিল, 'মানুষের কাছে যেয়ো না, এই জিনিষটা বড়ই জালেম।' সুতরাং দেখা দরকার মানুষ জিনিষটা কী রকম। আমার বাপ জঙ্গলের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও এই জিনিষটাকে ভয় পেতেন। তার এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই বস্তুটিকে ভয় পাওয়ার কারণ কী ? মনে হয় মানুষের শক্তি খুব বেশী। বাঘ তো দুই গজ লম্বা হয়ে থাকে। আর মানুষ মনে হয় দশ গজ, বিশ গজ লম্বা হবে! আসলে জিনিষটা কেমন একটু দেখা দরকার।"

কিন্তু তার আশে পাশে যে সকল জীব-জন্তু বাস করতো তারা বললো, 'দেখ ভাই বড়দের উপদেশ মানতে হয়। বাপ বলেছিল মানুষের কাছে যেয়ো না এইটা বড় জালেম জিনিষ। সুতরাং তুমি মানুষ দেখার ইচ্ছা করিও না। কোন না কোন বিপদে পড়ে যেতে পার।'

সে বললো, 'তা হবে কেন ভাই! কমপক্ষে একবার দেখে নেওয়া দরকার এই জাতটা কেমন!'

বাপের উপদেশ সে মানলো না। মানুষ দেখতে সে বাহির হয়ে পড়লো।

প্রথমেই একটি ঘোড়া দেখতে পেলো। ঘোড়াটি লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল। বাঘের বাচ্চা ভাবলো, মনে হয় এইটাই মানুষ। কারণ আমার বাপ ছিল দেড় গজ লম্বা আর এইটা তার চেয়ে অনেক লম্বা আর উঁচা। দুই-তিন গুণ বড় বলেই

আমার বাপ এইটাকে ভয় পেতো। ভয় পাওয়ার কথাই তো বটে! সে ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে বললো, "জনাব, আপনার নামই কি মানুষ ?"

ঘোড়া বললো, "এই কোন্ জালেম বস্তুর নাম নিয়েছো ? আমার সামনে আর কখনো মানুষের নাম নিয়ো না। মানুষ যাকে বলা হয় সে অত্যন্ত অত্যাচারী জীব। আমি অনেক মোটাতাজা এবং শক্তিশালী, কিন্তু তবু মানুষ আমার পীঠে গদি কষে দেয়, আবার তার উপর উঠে বসে। তার হাতে চাবুক থাকে। আমার পীঠে চাবুকের বাড়ি পড়ে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে হয়রান হয়ে যাই তবু মানুষ এত জালেম যে তখনও ক্ষান্ত হয় না, চাবুক মারতেই থাকে। তাই সব জিনিষের নাম নিও কিন্তু এই জালেম মানুষের নামটি নিও না। এটা একটা মহা মছিবত।"

বাঘের বাচ্চা ভাবলো, হায় আল্লাহ্! মানুষ তাহলে কত বড় হবে ! এই লম্বা-চওড়া জন্তুটিও মানুষকে ভয় পায় ! আর বাপ তো ভয় পেতে পেতে মারাই গেলেন। কী রকম এই ভয়ঙ্কর মানুষটি ?

আরো আগিয়ে গেল।

হঠাৎ একটি উঁট চোখে পড়লো। সে ভাবলো, এইটাই হবে মানুষ। একটি অঙ্গও এর সোজা নয়। ঘাড় একদিকে, কোমর অন্যদিকে, পা গুলি আরেক দিকে বাহির হয়ে কিম্ভুতকিমাকার আকৃতির এই জন্তুটিই মানুষ হবে, এটা ঘোড়ার চেয়েও চার হাত উঁচা। সে কাছে গিয়ে উঁটকে বললো, "মানুষ কি আপনারই নাম ?"

উঁট বললো, "আরে লা-হাউলা ওয়ালা-কুউওয়াতা! এই রকম জালেম চীজের নাম নিয়েছো তুমি? এর মত জালেম আর হয় না। এই নাম আমার সামনে উচ্চারণ করিও না। আমি শুধু একা নই, আমার শত শত ভাই আজ এর হাতে বন্দী। আমার নাকের ডগায় ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে তারপর সেই দড়ি আমার সামনের ভায়ের লেজে বেঁধে দিয়ে শত শত জনকে সারি বেঁধে মানুষের একটি মাত্র ছোট বাচ্চা টেনে নিয়ে যাচ্ছে । আমরা কত কাঁদি, কত বিলাপ করি, কত চিৎকার দেই; কিন্তু মানুষের ছোট একটি বাচ্চা আমাদেরকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। মানুষের কথার উপরে শত শত উঁটের একটি কথাও চলে না। এটা বড় জালেম চীজ। এই নাম আমার সামনে আর নিয়ো না।"

বাঘের বাচ্চা বললো, "হায় আল্লাহ্! মানুষ কত বিরাট হতে পারে ? এত বড় এই জন্তুটি সে-ও মানুষকে ভয় পায়। ঘোড়া তো শুধু নিজের মছিবতের কথা বলেছে আর এটা দেখি তার সকল ভাতৃসমাজের মছিবতের কথা বয়ান করলো। এক শ' উঁট এক সঙ্গে মানুষের একটি মাত্র বাচ্চার কাছে বাধ্য হয়ে যায়!"

ভয়ে ভয়ে সে সামনে অগ্রসর হলো।

হঠাৎ একটি হাতী দেখতে পেলো। সে ভাবলো, এইটাই মানুষ। কারণ চারটা মোটা মোটা খাম্বার উপর একটা বিল্ডিং এর মত দাঁড়িয়ে আছে,ছাদের উপরে যেন একটি পানির ট্যাঙ্ক রেখে দিয়েছে; সুতরাং মানুষ এইটাই। ভয়ে ভয়ে সে হাতীর কাছে গিয়ে বললো, "জনাব, আপনার নামই কি তবে মানুষ ?" মানুষ আপনাকে বলা হয় ?"

হাতী বললো, "তৌবা, আস্তাগফিরুল্লাহ্! এই কোন্ মছিবতের নাম নিয়েছো ? আমার সামনে এই নাম উচ্চারণ করিও না। এই জিনিষটা বড় জালেম। আমার দেহ বিরাট হতে পারে, দেখতে মনে হয় একটি বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। তা সত্ত্বেও একটি মাত্র বাচ্চা মানুষ আমার পীঠে চড়ে বসে। তারপর তার হাতে লোহার হান্টার থাকে, একটু যদি এদিক-ওদিক করি,সেই লোহার হান্টার আমার মাথায় মেরে দেয়। আমি শুধু কাঁদতে পারি, বিলাপ করতে পারি, আর কিছু করতে পারি না। ঘোড়ার মুখে তবু লাগাম লাগিয়ে সওয়ার হয়। আর আমাকে বিনা লাগামেই কাবু করে ফেলে। লাগামও নাই আবার নাকের দড়িও নাই তবু আমি মানুষের কাছে বাধ্য হয়ে পড়ি। এই মানুষ একটা আজীব চীজ!"

বাঘ বললো, "হায় আল্লাহ! মানুষ তাহলে কোন জিনিষকে বলবো ? যাকেই দেখি সেই মানুষকে ভয় পায়, মানুষের নাম শুনলে কেঁপে উঠে আর বলে, মানুষ বড় জালেম জিনিষ। আমি এখন কোথায় যাবো ? কোথায় মানুষ পাবো" ?

এই বলে সে আরও আগে অগ্রসর হলো।

দশ-বারো বৎসর বয়সের এক মিস্ত্রির ছেলে একটা মোটা কাঠ চিরার কাজে ব্যস্ত ছিল। কাঠের খন্ডটি উঁচুতে একটা মাচায় রাখা ছিল। করাত চালাতে সুবিধার জন্যে দুই পাশের কাঠ যেন ফাঁক হয়ে থাকে সেজন্যে আধা-চিরা কাঠের মাঝখানে একটা কাঠি দিয়ে গোঁজ দিয়ে রেখেছিল। বাঘের বাচ্চা ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে কাঠের খন্ডের উপর বসলো। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এই ছেলেটি মানুষ। কারণ সে ঘোড়া দেখেছে, উঁট দেখেছে এবং হাতী দেখেছে। সবাই মানুষকে ভয় পেয়েছে। এত বড় বড় জন্তু এই ছোট ছেলেটিকে দেখে ভয় পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং এটা মানুষ বলে কল্পনাও হলো না তার। শুধু অনুসন্ধানের জন্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ভাই মানুষ কোথায় পাওয়া যায় ?"

মিস্ত্রির ছেলে বললো, "আমাকেই মানুষ বলা হয়।"

বাঘের বাচ্চা বললো, "লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা! গজ খানিক লম্বা

একটা ছেলে বলছে, আমিই মানুষ! আমার বাপ কি তবে বোকা ছিল যে তোকে ভয় পাবে ? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি ? এক থাপ্পড় মেরে তোর কাম সারা করে দিব এখনই! ”

ছেলেটি ভাবলো, হাজার হলেও এটা বাঘ। এর সঙ্গে শক্তিতে পারা যাবে না, তর্ক করেও লাভ হবে না। বুদ্ধির জোর না হলে শক্তি দিয়ে এর কাছ থেকে প্রাণে বাঁচা যাবে না। সে দেখলো, যে-কাঠের খন্ডটি সে চিরার সময় একটা গোঁজ ঠুঁকে দিয়েছিল বাঘের লেজটি তার ফাঁকে ঢুকে গিয়ে নীচের দিকে ঝুলে আছে। সে বললো, “বাঘ মশাই, আপনি সব-কিছুই করতে পারেন। আপনি জঙ্গলের বাদশাহ্। আপনার শক্তি আছে, আমার শক্তি নাই। তাই এই গোঁজটি আমি খুলতে পারছি না। যদি আপনার শক্তি দিয়ে এই গোঁজটি খুলে দেন তবে আমার বড় উপকার হয়।”

বাঘ বললো, “এটা আবার একটা কাজ নাকি ?”

এই বলে সে এক থাবা মেরে সেই গোঁজটি খুলে ফেললো। আর অমনি দুই দিকের চিরা কাঠ চেপে এসে বাঘের লেজ আটকিয়ে ফেললো। বাঘের বাচ্চা চিঁ চিঁ করতে লাগলো। লেজ আর ছাড়াতে পারলো না।

এদিকে ছেলেটি চিৎকার করে “বাঘ ধরেছি, বাঘ ধরেছি” বলে গাঁয়ের লোক ডাকতে লাগলো।

মুহূর্তের মধ্যে সারা গাঁয়ের লোক জমা হয়ে বাঘের বাচ্চাকে বন্দী করলো লোহার খাঁচায়। মানুষ চেনার আগেই সে মানুষের একটি বাচ্চার হাতে এখন বন্দী। সে এখন মানুষ চিনেছে। কিন্তু এখন আর চিনে কি লাভ ? আজ তার রক্ষা নাই। কেউ বল্লম আনলো, কেউ বন্দুক,কেউ দা-বটি, মোটকথা যার কাছে যা ছিল তাই নিয়ে এসে বাঘের খাঁচা ঘেরাও করলো। আজ সবাই মিলে তাকে হত্যা করবে। আজ তাদের উৎসব।

বাঘ বুঝতে পারলো, বাপের উপদেশ না মানার কারণেই আজ আমার এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা আর এই মৃত্যু।

সুতরাং বাঘের শক্তি পরাজিত হলো। এলেমই বড় শক্তি। এলেমের কাছে সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এলেম সব কিছুকেই জয় করতে পারে।

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ যাদের এলেম আছে তাদেরকে ছাড়া সকলই ধ্বংসশীল।

—খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম; খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২১

তিন লক্ষ টাকার দোয়া

اَلْجَنَّةُ قَيْعَانٌ। অর্থাৎ জান্নাত একটি ফাঁকা ময়দান। শুধুমাত্র তোমাদের আমল সেই ময়দানকে ভরে দেয়। কখনো মহল, কখনো বাগান, কখনো সুন্দরী হুর ইত্যাদি যেরূপ এবাদত সেরূপ সম্পদ সেখানে জমা হয়। হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রঃ) এর স্বপনের একটি ঘটনা থেকে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

হযরত মওলানা ছিলেন কাশ্‌ফ্‌ওয়ালা বুযুর্গ, একজন কামেল ওলী। যারা মুহাক্কেক আলেম তারা অধিকাংশই মজযূব হয়ে থাকেন। হযরত মওলানার মধ্যেও সেই রকম মজযূবিয়াতের শান বিদ্যমান ছিল। যখন যে-ধারণা জাগে তখন তাই করতে লেগে যান। কেন করছেন, কী প্রয়োজনে করছেন তা কেউ জানে না। শুধু মনে লেগে গেছে তাই করে যাচ্ছেন। মজযূবগণের অভ্যাসই ঐ রকম। একবার রাত্রে হঠাৎ কী এক ধারণা জন্মালো, তিনি তিন লক্ষ টাকার জন্যে দোয়া করতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তিন লক্ষ টাকা দান করুন।"

কিন্তু কেন দিবেন তিন লক্ষ ? কী প্রয়োজন টাকার ? কিছুই না, শুধু মজযূবের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিফলন আর কি !

অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল দোয়া করতে করতে "হে আল্লাহ্! আমাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে দিন।"

তিন-চার ঘন্টা অতিবাহিত হলো। রাত দুইটা বেজে গেল। দোয়া করার অবস্থায় বসে বসেই মওলানার ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখেন সাদা রংয়ের একটা বিরাট অট্টালিকা। কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সাদা মহলটি। এত সাদা যেমন দুধ সাদা হয়ে থাকে। যেন একটা মনোমুগ্ধকর 'হোয়াইট হাউজ' বানিয়ে রাখা হয়েছে। তার উপরে প্রতিটি দেওয়ালের ধারে ধারে মনি-মুক্তা খচিত করা হয়েছে। প্রতিটি মুক্তা সূর্যের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল মহলের চারিদিকে আলোর বিচ্ছুরণ, শত শত সূর্য যেন স্নিগ্ধ আলো

বিকিরণ করছে। মহলটি মওলানার খুব পছন্দ হলো। সেখানে অনেক লোক বিচরণ করছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই এই মহলটি কার ?"

ওরা বললো, "এটা মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব ছাহেবের মহল। এটা জান্নাত। জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা এই মহলটি তাঁর জন্যে বানিয়েছেন। মওলানা এই কথা শুনে খুব খুশী হলেন। তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাহালেন।

কিন্তু দারোয়ান এসে বাধা দিল।

বললো, "এখন প্রবেশের সময় হয়নি। যখন সময় হবে তখন প্রবেশ করবেন। সময় হওয়ার আগে প্রবেশ করা যাবে না।"

অগত্যা মওলানা মহলটির চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। খুব ভাল লাগলো। সুবহানাল্লাহ! অদ্ভুত সুন্দর এই মহল। যার বাহিরেই এত সুন্দর ভিতরে তার কত সৌন্দর্য্যই না আছে ! দেখতে দেখতে তিনি এক কোণায় গিয়ে দেখেন সেখানে দেওয়ালের একটি মোতি নাই। মোতিটা সেখান থেকে খসে পড়েছে। জায়গাটি অন্ধকার হয়ে পড়েছে। মহলটির সব জায়গায় আলোয় আলোকময় অথচ এই কোণায় একটি মোতি নাই, অন্ধকার হয়ে পড়েছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না।

মওলানা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই এখানে মোতি লাগানো হয়নি কেন ? নাকি লাগানো হয়েছিল পরে খসে পড়েছে ? আর খসে পড়লোই বা কিভাবে ?"

লোকেরা বললো, "মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব ছাহেব আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিন লাখ টাকা চেয়েছেন। তাই আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন যে মহলের একটি মোতি খুলে পাঠিয়ে দাও। এটার দাম তিন লক্ষ টাকার চেয়েও বেশী। তাই এই মোতি খোলা হয়েছে।"

মওলানার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এখন তিনি অন্য রকম দোয়া শুরু করলেন, "ইয়া আল্লাহ! আমি তিন লক্ষ টাকা চাই না, তিন হাজার টাকা চাই না, তিন শত-ও চাই না। যদি আমার জান্নাতের মহল থেকে সরঞ্জাম খসিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়

তাহলে তো আমার জান্নাত ফাঁকা ময়দানই থেকে যাবে। আখেরাত ধ্বংস করে আমি দুনিয়ায় নিতে চাই না। সেখানেই আমি নিব।"

এই দোয়া এখন শুরু করে দিলেন।

দোয়া করতে করতে কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। আবার ঘুম এসে গেল। দেখেন আবার সেই মহল। সেই কোণায় যখন গেলেন তখন দেখেন সেই মোতিটি সেখানে লাগানো হয়েছে।

লোকেরা বললো, "মওলানা তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আবার আল্লাহ্র দরবারে আরজ করেছেন যে এখন তার টাকার দরকার নাই। তাই আবার মোতিটি সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

সুতরাং দুনিয়ার এবাদত আর যাবতীয় দুঃখ কষ্টের সওয়াব জান্নাতে সম্পদ হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফাঁকা ময়দানকে ভরে দেয়। যে এখান থেকে সওয়াব না পাঠাবে তার জান্নাত ফাঁকা ময়দান হয়েই পড়ে থাকবে।

জান্নাতে দুধের নহর, মধুর নহর, হুর গেলমান সব-কিছু নেয়ামত অবশ্যই আছে। কোরআন পাকে এসবের বর্ণনায় অনেক আয়াত রয়েছে। আবার হাদীস শরীফে আছে اَلْجَنَّةُ قِيْعَانٌ জান্নাত একটি ফাঁকা ময়দান।

এর অর্থ হলো যেমন আমাদের দেশের ময়দানে লোহার খনি আছে, তামা আছে, পিতল আছে, এমন কি সোনার খনিও আছে। সকল সম্পদই আছে; কিন্তু তবু ফাঁকা ময়দান। কারণ আমরা সেগুলি উত্তোলন করি না। আবার যে দেশের লোকেরা পরিশ্রম করে সেগুলি উত্তোলন করেছে তারা সোনাও পেয়েছে, রূপাও পেয়েছে, সব সম্পদই তারা ভোগ করতে পেরেছে।

সুতরাং দুনিয়াতে যারা পরিশ্রম করে এবাদত করেছে আর সওয়াবের উদ্দেশ্যে দুঃখ কষ্ট বরণ করেছে তাদের জান্নাতের ফাঁকা ময়দানটি সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের ময়দানে দুধের নহর, মধুর নহর, হুর-গেলমান সবই ফুটে উঠবে।

—খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২২৩।

'৭৮৬' সমাচার

১ম সঙ্গী ঃ ওকি, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন কেন ?

২য় সঙ্গী ঃ ৭৮৬ লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

১ম ঃ ৭৮৬ মানে ?

২য় ঃ মানে হলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ম ঃ সেটা কেমন করে ?

২য় ঃ এর প্রতিটি অক্ষর মান অনুপাতে হিসাব করলে ৭৮৬ দাঁড়ায়।

১ম ঃ এটা যদি জায়েয হয় তবে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত এক লাইনে আদায় করা শিঘ্রি কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে। অর্থাৎ সাত অর্বুদ, ছাপ্পান্ন কোটি, নিরানব্বই লক্ষ, উনসত্তুর হাজার, পাঁচ শ' আটত্রিশ।

২য় ঃ কী সর্বনাশ! চিন্তার কথা বটে। আর যখন কাউকে বলা হবে তুমি কি মুসলমান ? কালেমাটা শোনাও দেখি! তখন সে বলবে--সাত হাজার আট শ' এগার। এরপর নামাজও সংখ্যা দিয়ে আদায় করা শুরু হয়ে যাবে, সংখ্যা উচ্চারণ করে রুগীর গায়ে দম করা হবে ইত্যাদি। সত্যি ভাই, আমি একটা মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে ছিলাম।

এই বলে সঙ্গীটা আবার নতুন করে চিঠি লিখতে শুরু করলো।

-উর্দু ডাইজেস্ট।

চোর ধরার কৌশল

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর যুগে এক ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি হলো। চুরি করার সময় বাড়ীর মালিক চোরকে চিনে ফেলতেই চোর ধমকি দিয়ে মালিককে বললো, "যদি এই চুরির ব্যাপারে আমার নাম কাউকে বলে দাও তবে তোমার বউ তালাক হবে--একথা মুখে উচ্চারণ করে বল, নচেৎ তোমাকে এখনই প্রাণে বধ করবো।

মালিক প্রাণ–ভয়ে বললো, "যদি আমি চুরির ব্যাপারে তোমার নাম কাউকে বলে দিই তবে আমার স্ত্রী তিন তালাক হবে।"

এই কথা উচ্চারণ করিয়ে চোর পালিয়ে গেল।

পরদিন সকালে চুরির শোকে মালিক দিশাহারা হয়ে পড়লো। আরও কষ্ট হলো এইজন্যে যে চোরকে সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেও কাউকে বলতে পারছে না। বললেই বউ তালাক হয়ে যাবে।

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কথা মনে পড়ে গেল। দিশা হারা লোকটি ছুটে গেল হযরতের খেদমতে। বললো, "হুযুর এই পাড়ারই একজন লোক গত রাত্রে আমার বাড়ীতে চুরি করেছে। কিন্তু তার পরিচয় বলে দিলে আমার বউ তালাক হয়ে যাবে। সে চুরি করে যাওয়ার সময় আমাকে ভয় দেখিয়ে শর্তের তালাকের কথা উচ্চারণ করিয়ে গেছে।"

হযরত ইমাম সাহেব (রঃ) বললেন। "চিন্তার কোন কারণ নাই। চোর ধরা যাবে। তোমার বউ তালাক হবে না।"

ইমাম সাহেবের এই কথা শুনে সবাই অবাক হলো। চোরের পরিচয় বলে দিলে কোন অবস্থায়ই বউ তালাক না হয়ে পারে না। আলেমগণ বলাবলি করতে লাগলেন, 'ইমাম সাহেব মাসআলায় হের–ফের করে এবার বদনামের ভাগী হবেন কোন সন্দেহ নাই।'

কিন্তু ইমাম সাহেব বাড়ীর মালিককে ডেকে গোপনে বলে দিলেন "যারা চুরি করেনি তারা তোমার সামনে আসলে বলিও,'এরা চুরি করেনি।' আর যে ব্যক্তি চুরি করেছে সে তোমার সামনে আসলে চুপ করে থাকবা"।

অতঃপর জুমুআর নামায শেষে মসজিদের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিয়ে তিনি এবং বাড়ীর মালিক একটামাত্র খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

খোলা দরজাটি দিয়ে একটি করে লোক বাহির হয়ে যেতে লাগলো আর ইমাম সাহেব মালিককে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "এই লোকটি চুরি করেছে?"

মালিক বলে, "না এই লোক চুরি করেনি।"

এইভাবে যত লোক বাহির হয়ে যায় মালিক ঐ একই কথা বলে–'এই

লোকটি চুরি করেনি।'

অতঃপর একজন লোক বাহির হতে যায়। মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো,'এই লোকটি চুরি করেছে?'

মালিক চুপ করে রইল।

তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পারলেন এই লোকটিই চুরি করেছে। সুতরাং তাকে পাকড়াও করার হুকুম দিলেন।

এভাবে চুরির কথা বললো না তাই বউ তালাক হলো না। অথচ চোর ধরা পড়ে গেল।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ফেকাহ্র জটিল বিষয় সমূহকে এভাবেই সহজ এবং সাবলীল করে মানুষের সামনে রেখে দিয়েছেন। ফলে মানুষ তাকে ইমাম আযম বা মহান ইমাম হিসাবে অন্তরে স্থান দিয়েছে। জীবনে তিনি কোন কথায় বা যুক্তিতে কারো কাছে পরাজিত হননি।

–মাওয়ায়েজ।

ভুল ধরা ভুল

এক ব্যক্তি আয়কর বিভাগের ফরম পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় সন্তানের সংখ্যার ঘরটিতে 'আঠার সন্তান' লিখেছিল। সংশ্লিষ্ট অফিসার মনোযোগ সহকারে কাগজ পত্র দেখলেন এবং সন্তানের ঘরটিতে প্রশ্নবোধক একটি চিহ্ন এঁকে দিয়ে লিখলেন, 'মনে হয় এখানে আপনার কিছুটা ভুল হয়েছে।'

তারপর কাগজ পত্র শুদ্ধ করে জমা দেওয়ার জন্যে ফেরত পাঠালেন।

কয়েকদিনের মধ্যে কাগজ পত্র আবার জমা দেওয়া হলো। সেই ব্যক্তিটি লিখেছে, 'আমার একটি সন্তানের সংখ্যা লিখতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার সন্তানের সংখ্যা উনিশটি।'

সুতরাং খাদ্য ঘাটতি দূর করতে জন্মরোধ করা একটা ব্যর্থ পদ্ধতি একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। -- সাইয়ারা ডাইজেষ্ট

ডাক্তারের জন্যে কবর

রুগী ঃ ডাক্তার সাহেব, আমার চিকিৎসার খরচটা কম করে ধরবেন। আমি খুব গরীব মানুষ। হয়তো আমি কোনদিন আপনার কাজে লাগতে পারি।

ডাক্তার ঃ তুমি কী কাজ কর?

রুগী ঃ জী, আমি কবর খুঁড়ে থাকি।

সুতরাং যে-ডাক্তার মানুষ বাঁচানোর জন্যে আপ্রান চেষ্টা করে থাকে সে নিজেকেও বাঁচাতে পারে না। তাকেও শিঘ্র মরতে হবে। তারও কবর হবে।

-- সাইয়ারা ডাইজেষ্ট

"আল্লাহ্ না করুন"

প্রবল জ্বরে রুগী বেহুশ হয়ে পড়েছে। কয়েকঘন্টা পর কিছুটা হুশ হলে বিড় বিড় করে রুগী জিজ্ঞাসা করলো, "আমি কোথায় আছি ? আমি কি এখন জান্নাতে ? "

রুগীর স্ত্রী বললো, "আল্লাহ্ না করুন!"

-মাহ্নামা হুদা

পেট ফাঁপার চিকিৎসা

পূর্বকালে বাদশাহর দরবারে আলেমদের খুব কদর ছিল। এক বাদশাহ্ দীনী বিষয় নিয়ে তার দরবারে এক আলেমের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি শিশুকে নিয়ে এসে সেই আলেমের খেদমতে আরজ করলো ঃ

"হুজুর আমার এই ছেলেটির পেট ফেঁপেছে, ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। দয়া করে কিছু করুন যেন আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করেন।"

উক্ত বুযুর্গ শিশুটির পেট লক্ষ্য করে একটি ফুঁক দিলেন এবং বললেনঃ "যাও, নিয়ে যাও। ইনশা আল্লাহ্ ভাল হয়ে যাবে।"

বাদশাহ্ বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বুযুর্গকে বললেন ঃ

"হযরত! আমি আপনাকে জ্ঞানী ব্যক্তি ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি যা করলেন তার কোন যুক্তি দেখি না। শিশুটি যন্ত্রণায় কাতর অথচ তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র একটি ছু করে দিলেন। এই ছু করাতে কী যায় আসে ? রুগ্নদের প্রতি দয়া দেখানোই তো মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ।"

বুযুর্গ বললেনঃ বাদশাহ! আপনার লক্ষণ বেশী ভাল নয়। দেশের লোক আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তারা আপনার বদনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জনগণের অসন্তুষ্টি মঙ্গলজনক হয় না।

বাদশাহ্র মুখমন্ডল কালো হয়ে একে বারে যেন নূয়ে পড়লেন।

বুযুর্গ বললেন ঃ তবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই শুধু বদনাম ছড়ায়। কারণ দুষ্টের দমনের জন্যে আপনার কঠোরতায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। এতে প্রকৃতপক্ষে আপনার মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে।

বাদশাহর মুখ এবার হাস্যোজ্জল হয়ে উঠলো। আনন্দে মুখে কথার খৈ ফুটতে লাগলো।

বুযুর্গ বললেন ঃ কিন্তু দেশে দুষ্ট লোকদের সংখ্যাই অধিক। এরা বিদ্রোহ করলে আপনার ক্ষমতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা শুনে বাদশাহ্র মুখমন্ডল লাল হয়ে উঠলো। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন। আসন ছেড়ে উঠে দুই হাতের আস্তিন গুটাতে গুটাতে বললেন, "কে আছে আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করবে ? আমার সৈন্য আছে অস্ত্র আছে, বিদ্রোহ দমন করতে হয় কিভাবে তাও আমার জানা আছে ------।"

বুযুর্গ বললেন ঃ দুষ্ট লোকেরা সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের সাহস কম থাকে। বিদ্রোহ করার মত মনোবল তাদের নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মত ন্যায়পরায়ন বাদশাহ ইনশা আল্লাহ শান্তিতে থাকবেন এবং দেশেও শান্তি বিরাজ করবে।

এই কথা শুনে বাদশাহ শান্ত সুবোধ ছেলের মত আসনে বসে পড়লেন। তার চেহারায় প্রশান্তির ভাব ফিরে এলো। যেন তার কিছুই হয়নি।

এইবার বুযুর্গ বললেন, "দেখুন বাদশাহ্! আমি আপনাকে চারটি কথা বলেছি। এর দ্বারা আপনার অবস্থা চার বার পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম কথায় লজ্জায় অপমানে আপনার চেহারা কালো হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় কথা দ্বারা আপনি আনন্দিত হলেন। তৃতীয় কথায় আপনার মুখমন্ডল ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো, আপনি আসন ছেড়ে উঠে ছটফট করতে লাগলেন। চতুর্থ কথায় আপনার মুখমন্ডলে শান্ত ভাব ফিরে আসলো, আপনি নিশ্চিন্তে আসন গ্রহণ করলেন।

"দেখুন, আমি আল্লাহ্ পাকের এক নগন্য বান্দা। আমার কথা যদি আপনার উপর এতটা আছর করতে পারে তবে মহান আল্লাহ্র কথায় কি কোন আছর নাই ? তাঁর পবিত্র বাণীর প্রভাবে কি পাহাড় চূর্ণ হয়ে যেতে পারে না ? তার কথা কি মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে না ? রোগের উপশম হয়না? তবে কেন আপনার এই ধারণা জন্মালো যে শিশুটির দেহের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা পবিত্র কোরআনের বাণী তার উপর কোন আছর করবে না, তার রোগ উপশম হবে না "?

বাদশাহ্ এইবার নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হলেন এবং তৌবা করলেন জীবনে আর এরূপ কথা বলবেন না।

(হযরত থানবী (রঃ) এর খলীফা হযরত কারী মুহাম্মদ তাইয়েব (রঃ) এর ওয়াজ থেকে। ওয়াজটি ১৯৬১ সনে করাচী জুনা মার্কেটের দারুল কোরআন মাদ্রাসায় এক রাত্রির মহফিলে শোনা হয়। এই মূল্যবান ঘটনাটি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে স্মৃতি থেকে লিখে এখানে সংযুক্ত করা হলো।

–সংকলক ২০-১১-৯৪ ঈঃ)

পোলাও খাওয়ার ঘটনা

মানুষের রিজিক অবশ্যই তার কাছে আসবে, শর্ত এই যে সে আল্লাহর এবাদতে নিজেকে উৎসর্গ করে দিবে।

এই তথ্যটি এক ব্যক্তি একটি ওয়াজ মহফিল থেকে এই ভাবে শুনেছিল যে তকদীরে রিজিক থাকলে তা অবশ্যই মানুষকে খেতে হবে। না খেতে চাইলেও জোর করে খাওয়ানো হবে। এমন কি জুতা মেরে হলেও আল্লাহ্ খাওয়াবে।

এই কথা শোনার পর থেকে লোকটি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো -- এটি কি করে সম্ভব। আমি যদি না খাই তবে আল্লাহ্ কেমন করে খাওয়াবে এব বার দেখি । সুতরাং সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

তার মা তাকে রান্না করা খাবার এনে সামনে দিল। কিন্তু খেলো না।

তার মা বললো, "খাও"।

সে আরও জোরে বললো, 'খাবো না।'

এভাবে বারবার প্রত্যাখ্যান করার পর মা চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমার একটি মাত্র জোয়ান ছেলে। যদি না খেয়ে মারা যায় তবে ছেলে কোথায় পাবো ? যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো তখন সে পাড়ার ছেলেদেরকে ডেকে পরামর্শ করলো কি ভাবে তাকে খাওয়ানো যায়। সবাই বললো "তাকে চিৎ করে শুইয়ে জোর করে মুখে গুঁজে দেওয়াই উচিৎ"।

অবস্থা বিপদজনক দেখে লোকটি বাড়ী ছেড়ে পালালো।

মা তার পিছু ছাড়লো না। ছেলেকে খুঁজতে লোক পাঠালো। খুঁজতে খুঁজতে লোকজন গিয়ে দেখে লোকটি এক বিশাল জঙ্গলে গাছের আগায় উঠে লুকিয়ে আছে।

লোকজন তাকে ডাকলো, "নেমে এসো, তোমার মা ভাত খেতে ডাকছেন।"

লোকটি সজোরে বললো, "না, আমি ভাত খাবো না।"

অগত্যা লোকজন বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু তার মা না-ছোড় বান্দা। আবার লোকজন নিয়ে পরামর্শ করলো। সবাই বললো, "জোর করে ওকে খাওয়ানো যাবে না। বরং খুব সুস্বাদু খাবার রান্না করে গাছের নীচে রেখে আসতে হবে। ক্ষুধার সময় খাবারের সুগন্ধ পেলে গাছ থেকে নেমে এসে গোপনে খেয়ে নিতে পারে।"

সুতরাং হাঁড়ি ভরে সুস্বাদু পোলাউ রান্না করা হলো। গাছের নীচে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে রেখে সবাই চলে আসলো।

কিন্তু লোকটি অটল। সে কিছুতেই খাবে না। গাছের আগায় চুপ করে বসে থাকলো।

এদিকে একদল চোর সারা রাত চুরি করার পর সকাল বেলা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করলো। এখানে তারা চুরির মাল ভাগাভাগি করবে। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকেই তারা পোলাউয়ের সুন্দর খোশবু পেলো। ব্যাপার কি, এই গভীর জঙ্গলে পোলাউ কেন ? চোরের দল খুশী হয়ে পোলাউ খেতে গেল। চোরের সর্দার ধমক দিয়ে বললো, "খবরদার, কেউ পোলাউ খেয়ো না। আশে পাশে নিশ্চয় কোন মানুষ লুকিয়ে রয়েছে। এই খাবারের সংগে বিষ মাখানো আছে। আমাদের এই ভাগ বাটোয়ারার জায়গাটি কেউ সন্ধান পেয়ে গেছে। এই বিষ খেয়ে যখন আমরা মারা যাবো তখন আমাদের মালপত্র নিয়ে সে চম্পট দিবে।"

সর্দারের এই কথা শুনে চোরের দল ভয় পেয়ে গেল। তারা মানুষটির খোঁজ করতে লাগলো। দেখলো গাছের আগায় একটা লোক বসে আছে। সবাই মিলে গাছটিকে ঘিরে দাঁড়ালো যেন লোকটি না পালাতে পারে।

সর্দার লোকটিকে গাছ থেকে নামিয়ে হাঁড়ির সামনে নিয়ে বললো, "এই পোলাউ খাও।"

লোকটি সজোরে বললো, "না আমি খাব না।"

এবার চোরের দল বুঝলো সর্দারের অনুমান ঠিকই আছে। এই খাবারে বিষ মিশানো আছে সেই জন্যে লোকটি এই পোলাউ খাচ্ছে না।

সর্দার রাগে কট্‌মট্‌ করে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "খাও।"

লোকটি আবার বললো, "না, আমি খাবো না।"

"ব্যাটা খাবারে বিষ মাখিয়ে আমাদেরকে মারার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে আবার বলছে খাবে না" --বলেই সর্দার পা থেকে জুতা খুলে নিয়ে লোকটির মাথায় মারতে লাগলো-- খা, শিগ্‌গির খা!"

জুতার মার খেয়ে মনে পড়ে গেল সেই ওয়াজের কথা,তকদীরে রিজিক থাকলে আল্লাহ জোর করে এমনকি জুতা মেরে হলেও খাওয়ান। লোকটি নিশ্চিন্ত মনে তখন আল্লাহ্‌ পাকের অমূল্য নেয়ামত খেতে লেগে গেল।

লোকটি হয়তো আল্লাহর জন্যে কোনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে

রেখেছিল তাই এভাবে দুনিয়া তার পিছনে পিছনে ছুটে এসেছে।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার পিছনে ছুটে বেড়ায় দুনিয়া তাকে ধরা দেয় না, আল্লাহ্‌কেও সে হারায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পিছনে ছুটে যায় সে আল্লাহ্‌কে পায় এবং দুনিয়া তার পিছনে পিছনে ছুটে আসে।

–মসনবী শরীফের ঘটনা অবলম্বনে।

বাদশাহীর মূল্য

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) এর সঙ্গে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুলবন শত্রুতা ভাব পোষণ করতেন। কারণ হযরতের জনপ্রিয়তার দরুণ তার এই ধারণা জন্মেছিল যে তিনি তার বাদশাহী দখল করে নিবেন। অতঃপর একদিন সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পেশাব বন্ধ হয়ে গেল । শাহী দরবারের জ্ঞানী-গুনী সকলে মিলে যত রকম তদবীর এবং চিকিৎসা ছিল সবই করলেন। কিন্তু পেশাব আসলো না। প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হলো। সুলতানের মা দ্রুত হযরতের খেদমতে ছুটে গেলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং নিজের পুত্রের জন্যে দোয়ার আবেদন করলেন।

হযরত বললেন, "আমি তখনই শুধু তার জন্যে দোয়া করবো যখন সে তার সমস্ত বাদশাহী আমার নামে লিখে দিবে এবং তার উপর দরবারের সকল পরিষদের দস্তখত থাকবে।"

সুলতান অসুস্থতার দরুণ বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলেন এবং তার পেট ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর সুলতানের মা বাদশাহী লিখে দেওয়া কাগজ-পত্র নিয়ে হযরতের খেদমতে পেশ করলেন। হযরত নিযামুদ্দীন (রঃ) সেইটা টুকরা টুকরা করে একটি পাত্রে রেখে বললেন, " এই পাত্রে তাকে পেশাব করতে বল, পেশাব এসে যাবে।"

সুলতানের মা তাই করলেন। পেশাব এসে গেল। সুলতান নিষ্কৃতি

পেলেন।

তিনি এই আমলের দ্বারা এটাই প্রমানিত করলেন যে তার দৃষ্টিতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুলবনের বাদশাহীর মূল্য পেশাবের ধারার চেয়ে অধিক মূল্যবান নয় ।

তাঁর এরূপ অমূল্য দূর-দৃষ্টির প্রভাবে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

–হুদা, মে ১৯৮৫,পৃষ্ঠা ৬৭।

হিন্দু ওয়াহাবী

জুজুর নাম শুনে যেমন অনেকে ভয় পায় তেমনি ওয়াহাবী শব্দটি শুনে এদেশের অনেকে আঁতকে উঠেন। অন্তর্নিহিত অর্থ জানা না থাকায় শব্দটিকে বিদঘুটে মনে হয় এবং ক্রোধের সময় একে অপরকে ওয়াহাবী বলে গালি দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক মুসলমানই কিছু না কিছু ওয়াহাবী ভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও ওয়াহাবীর অস্তিত্ব কোথায় বলতে পারে না । ওয়াহাবী কোথায় থাকে খুঁজে পায় না । অবশ্য একটি মফস্বল শহরে এদেশের মুসলমানেরা একবার এক ওয়াহাবী দেখতে পেয়েছিল । ঘটনাটি ঘটেছিল এইভাবেঃ

এক হিন্দু দোকানদার এক মাদ্রাসার ছাত্রের কাছে বাকীতে জিনিষ বিক্রী করেছিল্। এক পর্যায়ে দুইজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এবং বাকী পরিশোধ হয়ে গেছে বলে ছাত্রটি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। কিন্তু দোকানদার মানতে রাজি নয়। ফলে দুইজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। দোকানদার বললোঃ তুমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কি বাটপার হতে চাও ?

ছাত্রটি ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে বললোঃ তুমি কেমন দোকানদার

হে ? তুমি তো দেখছি একজন খাঁটি ওয়াহাবী।

লোকজন শুনে ফেললো দোকানদারটি একজন ওয়াহাবী। আর যায় কোথায়। সবাই ছুটে এলো ওয়াহাবী দেখতে । 'কোথায় ওয়াহাবী, কোথায় ওয়াহাবী' বলে কেউ আনে লাঠি, কেউ আনে সড়কি, কেউ বল্লম। যার কিছুই নাই সে ঢেলা হাতে করেই অগ্রসর হয় ওয়াহাবী মারতে। যাদের বহুদিনের শখ ছিল ওয়াহাবী দেখার তারাও এসে দোকানটিকে ঘিরে ফেললো।

মেয়ে লোকেরা বললো, "এই লোকটাই কি ওয়াহাবী ? ওমা , এযে দেখি মানুষের মত! "

ছোট ছেলেরা মজা করার জন্যে ঢেলা ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

দোকানদার হাত জোড় করে বলতে লাগলো,'আমি ওয়াহাবী নই, আমি তো হিন্দু!'

কিন্তু কার কথা কে শোনে। হৈ চৈ এর মধ্যে তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল।

"ওয়াহাবী না হলে হাত জোড় করে মাফ চাইবে কেন ? এই বলে লোকজন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

দোকানদার অবস্থা বেগতিক দেখে ছাত্রটির পায়ে পড়ে গেল, "আমি আর তোমার কাছে টাকা চাইবো না। তুমি এদেরকে সরাও। এরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

ঘটনার আকস্মিকতায় ছাত্রটিও বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। তার অন্তরে দয়া হলো। সে একটি উঁচা জায়গায় দাঁড়িয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বললোঃ

ভাইসব, আপনারা সবাই মুসলমান। ওয়াহাবী সম্পর্কে আপনাদের কৌতুহল রয়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু যে-ওয়াহাবী আপনারা দেখতে ভীড় করেছেন এখানে সেই ওয়াহাবী নাই। আব্দুল ওয়াহাব হলেন হাম্বলী মাযহাবের লোক। তিনি সৌদী আরবের নজদ প্রদেশে দুইশ' বৎসর আগে জন্ম গ্রহণ করেন। রসূলের রওযা নিজেদের খুব কাছে হওয়ায় আরবের লোকেরা তখন রসূলকে এত অধিক সম্মান দেখাতো যে তা সম্মানের সীমা রেখা ছাড়িয়ে এবাদতের পর্যায়ে গিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। মুসলমানদের এই ঈমানী দুর্যোগের সময় আব্দুল ওয়াহাব বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা

করে দেখিয়ে দেন যে সম্মান রসূলের জন্যে এবং এবাদত আল্লাহ্‌র জন্যে। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো এমনকি রসূলেরও এবাদত করা যাবে না। এই কথাটি গ্রাম্য মূর্খদেরকে বুঝাতে গিয়ে তিনি চরম পন্থাও অবলম্বন করেন। যা ওদেশের লোকদের ঈমান রক্ষার জন্যে উপযোগী ছিল।

কিন্তু এদেশ থেকে বিষয়টিকে রসূলের প্রতি বেয়াদবী বলে মনে হয়েছে। ফলে এদেশের অনেকে এই মতবাদের সমালোচনা করে থাকেন এবং ক্রোধের সময় একে অপরকে ওয়াহাবী বলে গালি দিয়ে থাকেন।

আর যদি এদেশে ওয়াহাবী দেখতে চান তবে আমরা প্রত্যেকেই ওয়াহাবী। আব্দুল ওয়াহাব তৌহীদকে রক্ষা করার জন্যে এবং নির্ভেজাল একত্ববাদ পোষণ করার জন্যে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাত্র। আমরাও তৌহীদের অনুসারী। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানই এক একজন ওয়াহাবী।

ভাইসব, ওয়াহাবী দেখতে হলে বাড়ী ফিরে যান। সেখানে গিয়ে দেখুন আপনার বাপ ওয়াহাবী, আপনার মা ওয়াহাবী, আপনার ভাই বোন, স্ত্রী পুত্র সবাই ওয়াহাবী। আপনাদের বাড়ীতেই ওয়াহাবী আছে।

ছাত্রটির এই বক্তব্য শুনে সবাই ভাবলো নিজের বাড়ীতে বসেই যদি ওয়াহাবী দেখা যায় তবে এখানে প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে ভীড় ঠেলার কোন মানে হয় না। সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে ছুটে গেল। সেখানে দেখতে পেলো প্রিয়জনের মুখে ওয়াহাবীর রূপ। কারণ সবাই একত্ববাদী। সবার অন্তরে রয়েছে নির্ভেজাল তৌহীদ।

—মাওয়ায়েজ।

শিয়া-সুন্নী বাহাছ অনুষ্ঠানে জুতা চোর

পাঠক অবগত আছেন যে আল্লাহর রসূল আমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটা হক। তাঁর এন্তেকালের পর পর্যায়ক্রমে ছাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ রসূলের শিক্ষার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা রসূলের জীবদ্দশাতেই স্বীকৃত হয়েছিল। এই চারটি যুগের নীতিমালার ভিত্তিতেই আমরা মুসলমান। এর পরবর্তী যুগে যদি কোন মুসলমান নিজেদের জ্ঞান-প্রসূত মতবাদ গড়ে তোলে তবে তা বাতেল হিসাবে নিক্ষিপ্ত হবে। এই মতবাদ সকল মুসলমানই মেনে নিয়েছে।

একবার হযরত মওলানা কাসেম নানোতূবী (রঃ)কে শিয়াগণ চ্যালেঞ্জ করেন। সুতরাং এক বিরাট 'বাহাছ' (বিতর্ক) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিরাট এক মঞ্চের ওপর শামিয়ানা টানানো হলো। শিয়া আলেমগণ এসে মঞ্চ ভরে গেল। শিয়া জনগণ মঞ্চের চার পাশে ভীড় করলো। সুন্নী জনতাও অসংখ্য।

কিন্তু সুন্নী আলেমের কোন খোঁজ নাই। 'মওলানা কাসেম কোথায়?' 'মওলানা কাসেম কোথায়'? চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব শুরু হলো। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেলনা। সুন্নী জনগণ লজ্জায় মাথা নত করে রইল। শিয়ারা ভাবলো আমাদের আলেমদের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ হবে না। আমাদের আলেমে মঞ্চ ভরে গেছে। আর ওদের মাত্র একজন আলেম। কেতাব-পত্রও ওদের নাই। আমাদের কেতাবে স্তুপাকার হয়ে গেছে মঞ্চ। শিয়া আলেমগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ভাবলেন আমাদের বিরাট আয়োজন দেখে মওলানা কাসেম সরে পড়েছেন, তিনি আর আসবেন না। সুতরাং শিয়া আলেমগণ উৎফুল্ল হয়ে নিজেদের একতরফা বিজয় ঘোষণা করতে যাবেন এমন সময় দেখা গেল একজন লোক জনতার পিছন থেকে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। পরণে নীল লুঙ্গি, গায়ে মার্কিনের কোর্তা,

মাথায় সফেদ টুপি,দ্বিধাহীন অন্তর,চেহারায় সত্যের দীপ্তি। ভীতিহীন চাহনি নিয়ে তিনি মঞ্চে উঠলেন। পায়ের জুতা খুলে বগলে চেপে রাখলেন। ইনিই মওলানা কাসেম। সবার দৃষ্টিই মওলানা কাসেমের দিকে। কিন্তু মওলানা কাসেম বগলের জুতা কোথাও রাখছেন না কেন ? সবাই বল্লো, "হুজুর, জুতাগুলি এক পাশে রেখে দিন।"

মওলানা কাসেমঃ না, এখানে শিয়া আছে। এখানে জুতা রাখা যাবে না।

সবাই ঃ কারণ ?

মওলানা কাসেম ঃ শিয়ারা জুতা চুরি করে থাকে।

শিয়া আলেমগন অবাক হলেন এবং উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"কোথায় দেখেছেন শিয়াদেরকে জুতা চুরি করতে? কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে ?"

মওলানা কসেম ঃ কেন, রাসূলুল্লাহর মজলিস থেকে একজন শিয়া জুতা চুরি করেছিল আপনারা জানেন না ?

শিয়া আলেম ঃ বলেন কি ? রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় মুসলমানদের মধ্যে শিয়া মতবাদ চালুই ছিল না, শিয়া ব্যক্তি আসবে কোথায় থেকে ? আপনি কি ইতিহাস কিছুই জানেন না ?

মওলানা কাসেম ঃ মাফ করবেন। আমি ভুল বলেছি। রসূলুল্লাহর যামানায় নয়। ব্যাপারটি ঘটেছিল ছাহাবাদের যামানায়। ছাহাবাগণ তালিমে মশগুল ছিলেন এমন সময় একজন শিয়া এসে তাঁদের মহফিল থেকে জুতা চুরি করে নিয়ে যায়।

শিয়াঃ মিথ্যা কথা। এরূপ কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না। কারণ ছাহাবাদের যামানায় কোন শিয়া ছিল না।

মওলানা কাসেম ঃ তাহলে তাবেয়ীনের যামানায় ঘটনাটি ঘটেছিল।

শিয়া ঃ অসম্ভব! তাবেয়ীনের যামানায় কোন শিয়া ছিল না।

মওলানা কাসেম ঃ তাহলে নিশ্চয় তাবে-তাবেয়ীনের যামানায় শিয়া ব্যক্তিটি জুতা চুরি করেছিল।

শিয়া ঃ ইতিহাস সাক্ষী আছে এই চারটি যামানায় কোন শিয়া ছিল না। কারণ শিয়া মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে এই চারটি যামানার অনেক পরে। সুতরাং

শিয়াগন জুতা চুরি করতেই পারে না।

মওলানা কাসেম ঃ এই যে চারটি যামানার কথা বললেন, এর সঙ্গে আমাদের কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে বলতে পারেন?

শিয়া ঃ নিশ্চয় বলতে পারি। এই চার যামানার দেওয়া ইসলামের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আমরা মুসলমান। পরবর্তী যুগের দেওয়া সব ব্যাখ্যাই বাতেল এবং আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত।

মওলানা কাসেম ঃ একটু আগেই আপনারা স্বীকার করেছেন রসূলুল্লাহর যামানায় কোন শিয়া ছিল না। ছাহাবা, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীগণের যামানায়ও কোন শিয়া ছিল না। তাহলে কি আপনারা সেই মতবাদ গ্রহণ করেননি যা এই চার যামানার পরে সৃষ্টি হয়েছে এবং যা নিঃসন্দেহে বাতেল ও আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত?

শিয়া আলেমগণ নির্বাক। কোন জওয়াব নাই। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জনতা স্তব্ধ। মওলানা কাসেম এবার বগল থেকে জুতা বাহির করলেন। স্তব্ধ জনতার মধ্য দিয়ে জুতা পায়ে ধীর, স্বাভাবিক পদক্ষেপে অনুষ্ঠান থেকে বাহির হয়ে গেলেন। কোন অহংকার নাই, কোন বাহাদুরী নাই, জলসা পিছনে রেখে অনেক দূর চলে গেছেন। শিয়া আলেমগণ তখনও নির্বাক। জনতা তখনও স্তব্ধ।

--মাওলানা আব্দুল হামিদ,আল্লামা বিন্নুরী টাউন,করাচী,১৯৬২ ঈঃ।

আল্লাহ্কে দেখার অভিনব উপায়

হযরত হাজী সাহেব (রঃ) বয়ান করেন যে মওলানা ফখরুদ্দীন নিজামী (রঃ) অত্যন্ত উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে মানুষের এছলাহী কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।

একদিন এক মুরীদ তাঁর কাছে আরজ করলো, "আল্লাহ্কে দেখার আমার বড় ইচ্ছা। দয়া করে কোন অজিফা বলে দিন যেন আল্লাহ্ তা'লাকে

দেখতে পাই।"

তিনি বললেন, "ফরজ নামাজ তরক করে দাও।"

মুরীদ খুব আশ্চর্যান্বিত হলো যে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া কি সম্ভব?

তিন দিন পর আবার হাজির হয়ে বললো, "হযরত! আল্লাহ্‌কে দেখার বড় বাসনা। কোন অজিফা বলে দিন।"

তিনি বললেন, "তোমাকে অজিফা তো বলে দিয়েছি যে ফরজ নামাজ ছেড়ে দাও।"

এই কথা শুনে সে আবার ফিরে গেল। দুই তিন দিন পর হাজির হয়ে আবার সেই অনুরোধ করলো। তিনি ঐ একই জওয়াব দিলেন। মুরীদ চলে গেল।

কিন্তু ফরজ ছেড়ে দেওয়ার হিম্মত হলো না। তাই সুন্নত ছেড়ে দিয়ে রাত্রে শুয়ে পড়লো। স্বপ্নে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলো তিনি বলছেন, "হায় আল্লাহর বান্দা! আমার কী অপরাধ যে আমার সুন্নত ছেড়ে দিয়েছো?"

তখনই সে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়লো এবং অযূ করে সুন্নত আদায় করলো।

সকাল বেলায় এই ঘটনা হযরত নিজামী (রঃ) কে শুনালো।

তিনি বললেন, "যদি ফরজ নামাজ ছেড়ে দিতা তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই দেখা দিয়ে বলতেন, "আমার ফরজ কেন ছেড়ে দিয়েছো?"

--খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৬।

লোকটি সুন্নত তরক করেছিল কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে আবার সুন্নত আদায় করার সুযোগও হলো আবার রসূলুল্লাহর দীদারও হলো। ফরজ তরক করলেও ঐরূপ সময় থাকতেই আদায়ের সুযোগ হতো আবার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হতো। সুতরাং তরক করা একটি ভাণ মাত্র। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিলে পরে বুঝা যায় যে কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে যায়নি।

কামেল পীর এবং নেস্‌বত কায়েম হয়েছে এরূপ মুরীদের ক্ষেত্রেই শুধু এরূপ আমল করা সম্ভব। নতুবা গোমরাহীর ভয় রয়েছে।

পথ হারানো মহিলার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (রঃ) বলেন ঃ আমি একবার হজ্জে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি রাস্তা অতিক্রম করার সময় দেখলাম এক বৃদ্ধা বসে আছে। বৃদ্ধার পরিধানে একটি পশমের কামিছ এবং একটি পশমী ওড়না ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে সালাম করলাম। বৃদ্ধা জওয়াব স্বরূপ বললো--

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

"দয়াবান রবের তরফ থেকে সালাম।"

(সূরা ইয়াসীন, ৫৮ আয়াত)

আমি বল্লাম "আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আপনি এখানে বসে কী করছেন"?

তখন সে বল্লো--

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ

"আল্লাহ্ যাকে পথহারা করেন তাকে পথ দেখাবার আর কেউ থাকে না।"

(সূরা আরাফ, ১৮৬ আয়াত)

আমি বুঝতে পারলাম মহিলাটি পথ হারিয়ে ফেলেছে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যেতে চান আপনি?"

বললো--

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصٰى-

"তিনি একটি পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকছায় নিয়ে গিয়েছেন।"

(সূরা ইস্রা, ১ আয়াত)

বুঝতে পারলাম মহিলাটি হজ্জের কাজ শেষ করেছে--এখন সে বায়তুল মুকাদ্দস যেতে চায়। জিজ্ঞাসা করলাম, "কতক্ষণ এখানে বসে আছেন?"

বৃদ্ধা বললো--

ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

"পূর্ণ তিনটি রাত ধরে।"

(সূরা মারইয়াম, ৭৯ আয়াত)

আমি জিজ্ঞাসা করলাম--

"আপনার কাছে আহারের কিছু দেখছি না। কি খেয়ে কাটাচ্ছেন"?

জওয়াব দিলো--

هُوَيُطْعِمُنِى وَيَسْقِيْنِ

"তিনি আমাকে খাইয়ে থাকেন এবং তিনিই আমাকে পান করিয়ে থাকেন।"

(সূরা শুআ'রা, ৭৯ আয়াত)

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের দ্বারা অজু করে থাকেন ?"

বৃদ্ধা তখন এই আয়াত পড়লো--

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً

"পাক মাটি দিয়ে তখন তায়াম্মুম করে নিও।"

(সূরা নিসা, ৪৩ আয়াত)

আমি বললাম, "আমার কাছে কিছু খাবার আছে, খাবেন?"

জওয়াব স্বরূপ তেলাওয়াত করলো--

اَتِمُّوْا الصِيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

"রাত যখন হবে তখন এফতার করিও।"

(সূরা বাকারা, ৮৭ আয়াত)

আমি বল্লাম, "কিন্তু এটাতো রমজান মাস নয়।"

বৃদ্ধা তেলাওয়াত করলো--

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

"যে-ব্যক্তি সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নফল এবাদত করে থাকে আল্লাহ্ তার কদর করে থাকেন এবং তিনি সব জানেন।"

(সূরা বাকারা, ১৫৮ আয়াত)

আমি বললাম, "মুসাফির অবস্থায় ফরয রোযাও তো না-রাখা জায়েয আছে।"

মহিলা জওয়াব দিল –

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"(কত যে সওয়াব) তোমরা যদি জানতে তাহলে রোজা রাখাটাই ভাল মনে করতে।"

(সূরা বাকারা, ১৮৪ আয়াত)

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমার মত করে কেন কথা বলেন না ?"

জওয়াব পেলাম –

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

"মানুষ যে কথাটিই বলছে খবরদারীর জন্যে তার কাছে একজন ফেরেশতা প্রস্তুত আছে।"

(সূরা কা'ফ, ১৮ আয়াত)

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কোন্ গোত্রের লোক।"

সে বললো–

لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

"যে-বিষয়ে জানতে নাই সে-বিষয়ের পিছনে লাগিওনা।"

(সূরা ইস্‌রা, ৩৬ আয়াত)

আরজ করলাম, "ভুল হয়ে গেছে, আমি মাফ চাইছি।"

মহিলা বললো–

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

"আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরষ্কার নাই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিন।"

(সূরা ইউসুফ, ৯২ আয়াত)

আমি বল্লাম, "যদি চান তবে আমার উঁটনির পীঠে সওয়ার হয়ে আপনার দলের লোকের কাছে যেতে পারেন।"

বৃদ্ধাটি বললো–

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ

"তোমরা যা-কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ্ তা' জেনে থাকেন।"

(সূরা বাকারা, ১৯৭ আয়াত)

এই আয়াত শোনার পর আমি আমার উঁটনিকে বসালাম। কিন্তু মহিলা তার পীঠে সওয়ার হওয়ার আগে বললো–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

"মোমেন ব্যক্তিদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নীচের দিকে করে রাখে।"

(সূরা নুর, ৩০ আয়াত)

আমি আমার দৃষ্টিকে অবনত করে তাকে বললাম, "এবার সওয়ার হন।"

বৃদ্ধা সওয়ার হতে গেল। কিন্তু উঁটনি ভয় পেয়ে পালাতে উদ্যত হলো। ধস্তা-ধস্তির ফলে বৃদ্ধার কাপড় ছিঁড়ে গেল। তখন মহিলা বললো--

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

"যত মছিবত এসে থাকে তা' তোমাদের আমলের কারণে।"

(সূরা শূরা, ৩০ আয়াত)

আমি বললাম, "একটু অপেক্ষা করেন উঁটনি বেঁধে দিচ্ছি তারপর সওয়ার হয়েন।"

সে বললো--

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمٰنَ ـ

"এই সব বিষয়ের সমাধান আমি সুলাইমান (আঃ) কে শিখিয়ে দিয়েছি।"

(সূরা আম্বিয়া, ৭৯ আয়াত)

আমি উঁটনি ভাল করে বাঁধলাম। তারপর তাকে বললাম, "এবার সওয়ার হন।"

সে সওয়ার হয়ে এই আয়াত পড়লো--

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি এইটাকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। আমাদের ক্ষমতা ছিল না তাকে আয়ত্ত করার। আর আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে নিঃসন্দেহে ফিরে যাবো।"

(সূরা যুখ্‌রাফ, ১৪ আয়াত)

আমি উঁটনির লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলাম। খুব জোরে হাঁটছিলাম আর চিৎকার করে করে উঁটনি তাড়াচ্ছিলাম। এই দেখে বৃদ্ধা বললো–

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"স্বাভাবিক পন্থায় হাঁট আর তোমার স্বর অবনত কর।"

(সূরা লুকমান, ১৯ আয়াত)

এবার আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম এবং কবিতার কয়েকটি ছন্দ গুণ গুণ করে গাইতে লাগলাম। এই দেখে মহিলাটি বললো--

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

"কোরআন থেকে যে অংশ সহজ মনে হয় তাই পড়।"

(সূরা মুয্‌যাম্মেল, ২০ আয়াত)

আমি বললাম, "আল্লাহ্‌পাক সত্যি আপনাকে নেককার মহিলা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন"।

তখন সে বললো--

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوْا الاَلْبَابِ

"যাদের জ্ঞান আছে তারাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"

(সূরা আল-ইমরান, ৭ আয়াত)

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ চলার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার স্বামী আছে? "

মহিলা বললো--

لاَتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"তোমরা এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না যা' প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে খারাপ লাগতে পারে।"

(সূরা মায়েদাহ্, ১০১ আয়াত)

এবার আমি চুপ হয়ে গেলাম। যতক্ষণ কাফেলা না পাওয়া গেল আমি তার সাথে কোন কথা বললাম না। কাফেলা যখন সামনে দেখতে পেলাম তখন তাকে বললাম,

"এই যে সামনে কাফেলা এসে গেছে। এই কাফেলায় আপনার কে আছে?"

সে বললো--

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"সম্পদ এবং পুত্র--এসব দুনিয়া-জীবনের বিলাসিতা।"

(সূরা কাহাফ, ৪৬ আয়াত)

আমি বুঝতে পারলাম এই কাফেলায় তার ছেলে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী কাজ করে সে এই কাফেলায় ?"

বৃদ্ধা জওয়াব দিল--

وَعَلمتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ -

"অনেক চিহ্ন আছে। আর নক্ষত্রের সাহায্যে তারা পথের নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে।"

বুঝতে পারলাম তার ছেলে এই কাফেলার পথ নির্দেশক 'রাহ্বর'। মহিলাকে নিয়ে কাফেলার তাঁবুতে গেলাম। সেখানে বল্লাম, "বলুন এইবার এখানে আপনার কে আছে?"

স্ত্রীলোকটি বললো--

وَاتَّخَذَاللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً
وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا
يَايَحْىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

"এবং আল্লাহ্ তা'লা ইব্রাহীমকে দোস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

(সূরা নিসা, ১২৫ আয়াত)

"আর মূসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন।"

(সূরা নিসা, ১৬৪ আয়াত)

"হে ইয়াহিয়া! সজোরে কেতাব ধারণ কর।"

(সূরা মারইয়াম, ১২ আয়াত)

এই আয়াতগুলি শোনার পর আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, "হে ইব্রাহীম। হে মূসা! হে ইয়াহিয়া।"

কিছুক্ষণ পর চাঁদের মত সুন্দর কয়েকজন নৌজোয়ান আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমরা যখন স্থির হয়ে আসন গ্রহণ করলাম তখন মহিলা তার ছেলেদেরকে বললো-

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ-

"এই টাকা দিয়ে তোমাদের মধ্যে হতে কাউকে শহরে পাঠাও। সে অনুসন্ধান করে দেখবে কোন্ খাবারটি অধিক পবিত্র। তখন সে তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসবে।"

(সূরা কাহাফ, ১৯ আয়াত)

এই আয়াত শুনে তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে উঠে গেল এবং

কিছুক্ষণ পরে খাবার নিয়ে আসলো। খাবার আমার সামনে যখন রাখা হলো তখন মহিলাটি বললো--

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"সানন্দে খাও এবং পান কর। এগুলি তোমাদের সেই কাজের বিনিময় যে-কাজ তোমরা পূর্বে করে এসেছো।"

(সূরা আলহাক্কাহ্, ২৪ আয়াত)

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছেলেদেরকে বললাম, "এই খাবার আমার জন্যে হালাল হবে না যতক্ষণ-না তোমরা এই মহিলার রহস্য বলছো।"

ছেলেরা বললো, "চল্লিশ বৎসর থেকে আমাদের মায়ের এই অবস্থা। এই চল্লিশ বৎসরে তিনি কোরআন পাকের আয়াত ছাড়া একটি বাক্যও বলেননি। এই জন্যে এই নিয়ম তিনি পালন করছেন যেন জিহবা থেকে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বাহির না হয়ে পড়ে। তাহলে আল্লাহ্ নারাজ হবেন।" আমি বললাম-

ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءَ - وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"এ সব আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের নেয়ামত। যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীল মহান।"

(সূরা হাদীদ, ২১ আয়াত)

আল-আবশেহী (রঃ)। আল-মুস্তাতারফু ফি কুল্লে ফন। মুস্তাতরফ ১ম খন্ড ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা। মিশর ১৩৬৮ হিজরী।

হাসির অপর পীঠ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ

"তোমরা কি আল্লাহর এই কালামে আশ্চর্য বোধ করছো ? এবং হাসছো, ক্রন্দন করছো না ?"

–সূরা আন-নজম

হাসির অপর একটি দিক আছে। দুনিয়াতে যারা সেই দিকটিতে বিচরণ করেছে তারাই কামিয়াব হয়ে গেছে। এই অপর দিকটির নাম হলো ক্রন্দন। বস্তুতঃ হাসির পরিপূরক হলো ক্রন্দন করা। পরিপূর্ণ মোমেন হলো সেই যে সামান্য হাসির পর অধিক ক্রন্দন করবে। যেমন মোমেনের পরিচয় দিয়ে

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

"আর তারা রসূলের প্রতি যা' অবতীর্ণ হয়েছে, তা' যখন শোনে; তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে"।

সুতরাং যারা সত্যকে চিনে নিয়েছে তারা হাসিতে আনন্দ পায় না। কারণ কঠিন দিবসটি সত্য এবং সমাগত। এখন হাসির চেয়ে কাঁদতেই অধিক মজা। কবির ভাষায় ঃ

نہ جاگنے میں لذت نہ شب کے سونے میں
مزہ جو آتا ہے پچھلے پہر کے رونے میں

"রাত্রিতে জেগে থাকতে আনন্দ নাই, ঘুমেও মজা নাই ; গভীর রাতে শুধু কাঁদতেই মজা ।"

সমাপ্ত

ঢাকা সফরে
হযরত থানুবী (রঃ)

একবার ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ্ খান সাহেব হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানুবী (রঃ) কে দাওয়াত করলেন। তিনি চারটি শর্তে ঢাকা সফর করতে রাজি হলেনঃ-

এক ঃ কোন টাকা-পয়সা হাদিয়া দিতে পারবে না।

দুই ঃ অবস্থানের জায়গা কোন খাছ কামরা হতে পারবে না ; বরং এমন জায়গা হতে হবে যেখানে জনসাধারণ তাঁকে বিনা বাধায় দেখতে পারে।

তিন ঃ নওয়াবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নির্দিষ্ট সময় থাকবে। তখন অন্য কেহ তাঁর সঙ্গে আসতে পারবে না। এইরূপ ব্যবস্থায় অধিক ফয়েজ লাভ হতে পারে।

চার ঃ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ওয়াজ করতে বলতে পারবে না ।

এই শর্তগুলি নওয়াব সাহেব খুশী হয়ে মেনে নিলেন। অতঃপর নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ছাহেব মওলানাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে তৎকালীন বৃটিশ ভাইসরয়ের মতন করে অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। রেল ষ্টেশনের প্লাট ফরমে মখমলের ফরাশ, রাস্তার দুই ধারে পতাকা ও জনতার কাতার এমনকি পথে ফুলের পাঁপড়ি ছিঁটানোর ব্যবস্থাও করা হলো। নওয়াব সাহেবের চাচার মুখে যখন মওলানা থানুবী (রঃ) এই জাঁকজমক পূর্ণ অভ্যর্থনার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তা শরীয়ত বিরোধী বলে অভিহিত করে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর নওয়াব সাহেব তার বিরাট জমিদারীর নায়েব, ম্যানেজার ও শহরের বিশিষ্ট গন্যমাণ্য ব্যক্তি সমন্বয়ে অভ্যর্থনা কমিটি দ্বারা হযরত থানুবী (রঃ) কে অভ্যর্থনা করতে চাহালেন। কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না । তিনি বললেনঃ এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা আমার স্বভাব বিরোধী।

এতদসত্বেও মওলানার ঢাকা আগমনের কথা শুনে তাঁর গাড়ী দাঁড়াবার ষ্টেশনে অসংখ্য লোক ভীড় করেছিল। নওয়াব বাহাদুর তাঁর খাছ গাড়ীতে মওলানাকে বসিয়ে তিনি নিজে অন্য গাড়ীতে চড়লেন। মওলানা তাকে একই গাড়ীতে এসে বসতে বললেন। কিন্তু নওয়াব বাহাদুর বেয়াদবী মনে

করে ঐ গাড়ীতে উঠলেন না। এমনকি একই দস্তরখানে বসে তাঁর সঙ্গে খানাও খেলেন না। নওয়াব সাহেব তার বেগমদের দ্বারা নতুন নতুন খানা পাকিয়ে নিজ হাতে তা মওলানার প্লেটে পরিবেশন করতেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ছিলেন দীনদার এবং জ্ঞানী । তিনি মওলানার হাতে বয়আত হতে চাহালেন । মওলানা এই বলে অস্বীকার করলেন যে , যাকে ধমক দেওয়া যাবে না তাকে বয়আত করাতে ফায়দা হবে না । তবু নওয়াব সাহেব যখন পত্রাদি লিখতেন তখন তিনি পত্রে " আপনার মুরীদ সলীমুল্লাহ্ " শব্দগুলিই লিখতেন।

ঢাকা সফর কালে হযরত থানুবী (রঃ) বিভিন্ন ওয়াজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনের কাছে এসে প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরেন এবং অনেক আধুনিক কু-সংস্কার থেকে তাদেরকে মুক্ত করেন। আধুনিক শিক্ষিতদের মনে ইসলামের প্রতি যে-সকল দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল সেগুলি তার হেকমতপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা মূহুর্তেই নিরসন করেন।

কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হযরত থানুবী (রঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন, "হযরত ! যারা মাদ্রাসায় দীনী শিক্ষা লাভ করে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে দেখা যায় না ; এরা অন্যের মুখাপেক্ষী এবং সমাজে আশ্রিত হয়ে জীবন যাপন করে । তাদের এরূপ হওয়ার কারণ কি ? এটা কি ইসলামী শিক্ষার ফল ? "

হযরত থানুবী (রঃ) বললেন, "এটা ইসলামী শিক্ষার ফল নয়। বরং আপনারা যারা উচ্চশিক্ষিত বিত্তবান তাদের সন্তানকে মাদ্রাসায় না দেওয়ার দরুণই এরূপ হয়ে থাকে। আপনাদের মেধাবী ছেলেরা যায় স্কুলে আর যারা সহায় সম্বলহীন তাদেরকেই পাঠানো হয় মাদ্রাসায়। ফলে তারা দীনী শিক্ষা লাভের পরও সেইরূপই থেকে যায়। সুতরাং এটা ইসলামী শিক্ষার ফল নয়।"

এই কথা শুনে আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ বললেন, "ইসলামী শিক্ষার প্রতি আমাদের যে ভুল ধারণা ছিল এতদিনে তা দূর হলো এবং ঈমানও রক্ষা হলো।"

হযরত থানুবী (রঃ) এর প্রভাবে বিত্তবানেরা মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসে এবং ঢাকায় দীনী শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

ঢাকায় তাঁর এই সফর ছিল এদেশের মানুষের জন্যে এক বিরাট পাওয়া। তাঁকে একটিবার মাত্র দর্শন করে মানুষের হৃদয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে মূহুর্তেই তাদেরকে করে দিয়েছে এক নিষ্পাপ শিশুর মত সহজ সরল পথের যাত্রী; যে যাত্রা আজও এদেশের মানুষের শেষ হয়নি।

লেখক পরিচিতি

বংশ পরিচয় ঃ মওলানা রাজি নোমানীর পিতামহ মওলবী শেখ আব্দুল গফুর ছিলেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের অন্তর্গত শুজাপুর জামে মসজিদের ইমাম। ইমামতির সাথে সাথে তিনি মানুষের এছলাহী তরবিয়তের জন্যে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এলেমের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁর দুই পুত্রকে হক্কানী আলেমরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

পিতৃব্য ঃ জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা মওলা বখ্শ মুর্শিদী (রঃ) দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সনদ প্রাপ্তির পর দীর্ঘকাল যাবৎ হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানুবী (রঃ) এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। তাঁর বিশিষ্ট সহপাঠিগন ছিলেন কারী মুহম্মদ তাইয়েব (রঃ) ও মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)। স্বহস্তে লিখিত তিরমিজী শরীফের শরাহ্ মওলানা মুর্শিদীর এক অমূল্য কীর্তি। এই শরাহ্ তিনি হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রঃ) এর দরস থেকে সরাসরি শুনে নিখুঁত ভাবে লিখেছিলেন। কুষ্টিয়ার নিবাস স্থাপন করার পর তিনি শর্ষিনা, সিরাজগঞ্জ ও রংপুরের বিভিন্ন মাদ্রাসায় আজীবন মুহাদ্দেস হিসাবে এলেমের খেদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৭৩ সনে তিনি কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়ায় এন্তেকাল করেন।

পিতৃ পরিচয় ঃ মওলবী আব্দূল গফুরের দ্বিতীয় পুত্র মওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী (রঃ) ১৯২৩ সনে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সনদপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি লাহোর গমন করেন। সেখানে মওলানা আহ্মদ আলী লাহোরী (রঃ) এর কাছে তফসীরের বিশেষ পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করার পর সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় "সীবওয়াইহ্" সহ অনেক জটিল কেতাব পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন।

মওলানা মুর্শিদাবাদীর এলেম ও তাছাউফের কথা শ্রবণ করে মোমেনশাহী জেলার তৌহিদী জনগণ মওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর নেতৃত্বে তাঁকে অনুরোধ করেন সেখানে পরিদর্শন করতে। তিনি ১৯২৬ সনে মোমেনশাহীর গফরগাঁও পরিদর্শনে গমন করেন। সেখানকার তৌহিদী জনগণ তাঁর এলেম ও তাছাওউফে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেখানে নিবাস স্থাপনে অনুরোধ করেন। অতঃপর দলে দলে যেমন সাধারণ লোকেরা এসে তার কাছে তাছাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে তেমনি এলেমের পিয়াসী ছাত্রের দল তাঁর মাদ্রাসায় এসে আকণ্ঠ এলেমের সুধা পান করে পিয়াসা নিবারণ করতে থাকে। গফরগাঁয়ে তিনি জামেয়া মিল্লিয়া

প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রায় ৫৬ বৎসর দীনী খেদমত করার পর ১৯৮৩ সনে গফরগাঁয়ে ইন্তিকাল করে। আংশিক 'মজযূব' থাকা সত্ত্বেও তিনি বাতেলের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন।

দীনী এলেমের মশালবাহী এই পরিবারে লেখক মওলানা রাজি নোমানী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর বৃহত্তর রাজশাহীর রাজাপুরে তাঁর পিতা বসতি স্থাপন করেন। সেখানে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের পর উচ্চতর দীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য করাচী গমন করেন। সেখানে তিনি আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রঃ) এর কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পাঞ্জাবে হযরত মওলানা আব্দুল্লাহ্ দরখাস্তী (রঃ) এর কাছে তফসীরের সনদ লাভ করেন। করাচীতে থাকা কালীন তিনি মওলানা থানুবী (রঃ) এর অন্যতম খলীফা হযরত শাহ্ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রঃ), মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ) এবং মওলানা এহ্‌তেশামুল হক থানুবী (রঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষা লাভ করেন।

আল বালাগ পাবলিকেশন্সের মাসিক আলবালাগ তাঁরই সহযোগিতায় আত্ম প্রকাশ করে। বাংলায় তফসীরে নূরুল কোরআন সহ ঐ প্রতিষ্ঠানের বহু দীনী কেতাব লিখায় তিনি সহযোগিতা করেন। যাত্রাবাড়ী মাদানিয়া মাদ্রাসার মাসিক দীনী পত্রিকা 'আল-জামেয়া' তাঁর প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ ও সম্পাদিত হয়। এই মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন আল-জামেয়া সম্পাদনাকালে তিনি অনেক কৃতি আলেমকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল উলামা কেরাম বাংলায় বহু দীনী গ্রন্থ রচনা করে বর্তমানে সমাজকে উপহার দিচ্ছেন।

এরপর তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মারকাজে উলূমুল কোরআন স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মাসিক শান্তিধারা ও অন্যান্য দীনী কেতাব প্রকাশনা ছাড়াও তিনি ঢাকা নগরীর বিভিন্ন মসজিদে নিয়মিত পবিত্র কোরআনের তফসীর করে থাকেন। ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদের তিনি একজন জনপ্রিয় ওয়ায়েজ। শুক্রবার জুমাআর নামাজের পূর্বে তিনি দেশের জাতীয় এই মসজিদে তাছাওউফ পূর্ণ এছলাহী ওয়াজ করে থাকেন। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি থানুবী (রঃ) অনুসারী একজন ওয়ায়েজ হিসাবে পরিচিত।

তিনি প্রতিদিন মারকাজে উলূমুল কুরআনে বাদ আছর মানুষের রূহানী এছলাহের জন্যে বয়ান করে থাকেন।